চতুর্থ সংখ্যা] শ্রাবণ ১৩২১ [প্রথম বর্ষ

সবুজ পত্র

সম্পাদক—শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

সবুজ পত্র

সর্ব্বনেশে

এবার যে ঐ এল সর্ব্বনেশে গো !
বেদনায় যে বান ডেকেছে
রোদনে যায় ভেসে গো !
রক্ত-মেঘে ঝিলিক মারে,
বজ্র বাজে গহন-পারে,
কোন্ পাগল ঐ বারে বারে
উঠ্‌চে অট্ট হেসে গো !
এবার যে ঐ এল সর্ব্বনেশে গো !

জীবন এবার মাতল মরণ-বিহারে !
এই বেলা নে বরণ করে
সব দিয়ে তোর ইহারে !
চাহিস্‌নে আর আগু-পিছু,
রাখিস্‌নে তুই লুকিয়ে কিছু,
চরণে কর্‌ মাথা নীচু
সিক্ত আকুল কেশে গো !
এবার যে ঐ এল সর্ব্বনেশে গো !

পথটাকে আজ আপন করে নিয়ো রে !
গৃহ আঁধার হল, প্রদীপ
নিবল শয়ন-শিয়রে ।
ঝড় এসে তোর ঘর ভরেছে,
এবার যে তোর ভিত নড়েছে,
শুনিস্‌ নি কি ডাক পড়েছে
নিরুদ্দেশের দেশে গো !
এবার যে ঐ এল সর্ব্বনেশে গো !

ছি ছি রে ঐ চোখের জল আর ফেলিস্‌নে !
ঢাকিস্‌ নে মুখ ভয়ে ভয়ে
কোণে আঁচল মেলিস্‌ নে !

কিসের তরে চিত্ত বিকল,
ভাঙুক না তোর দ্বারের শিকল,
বাহির পানে ছোট্ না, সকল
দুঃখ সুখের শেষে গো !
এবার যে ঐ এল সর্ব্বনেশে গো !

কণ্ঠে কি তোর জয়ধ্বনি ফুট্‌বে না ?
চরণে তোর রুদ্র তালে
নূপুর বেজে উঠ্‌বে না ?
এই লীলা তোর কপালে যে
লেখা ছিল,—সকল ত্যেজে
রক্তবাসে আয়রে সেজে
আয় না বধূর বেশে গো !
ঐ বুঝি তোর এল সর্ব্বনেশে গো !

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাস্তব

লোকেরা কিছুই ঠিক-মত করিতেছে না, সংসারে যেমন হওয়া উচিত ছিল তেমন হইতেছে না, সময় খারাপ পড়িয়াছে, এই সমস্ত দুশ্চিন্তা প্রকাশ করিয়া মানুষ দিব্য আরামে থাকে, তাহার আহার-নিদ্রার কিছুমাত্র ব্যাঘাত হয় না, এটা প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। দুশ্চিন্তা-আগুনটা শীতের আগুনের মত উপাদেয়, যদি সেটা পাশে থাকে কিন্তু নিজের গায়ে না লাগে।

অতএব যদি এমন কথা কেহ বলিত যে আজকাল বাংলা দেশে কবিরা যে সাহিত্যের সৃষ্টি করিতেছে তাহাতে বাস্তবতা নাই, তাহা জনসাধারণের উপযোগী নহে, তাহাতে লোক-শিক্ষার কাজ চলিবে না, তবে খুব সম্ভব আমিও দেশের অবস্থাসম্বন্ধে উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া বলিতাম, কথাটা ঠিক বটে; এবং নিজেকে এই দলের বাহিরে ফেলিতাম।

কিন্তু একেবারে আমারি নাম ধরিয়া এই কথাগুলি প্রয়োগ করিলে অন্যের তাহাতে যতই আমোদ হোক আমি সে আমোদে খোলা মনে যোগ দিতে পারি না।

তবে কিনা, বাসর-ঘরে বর এবং পাঠক-সভায় লেখকের প্রায় একই দশা। কর্ণমূলে অনেক কঠিন কৌতুক উভয়কে নিঃশব্দে সহ্য করিতে হয়। সহ্য যে করে তাহার কারণ এই, একটা জায়গায় তাহাদের জিত আছে। যে যতই উৎপীড়ন করুক, যে বর, তাহার কনেটিকে কেহ হরণ করিবে না; এবং যে লেখক, তাহার লেখাটা ত রইলই।

অতএব নিজের সম্বন্ধে কিছু বলিব না। কিন্তু এই অবকাশে সাধারণভাবে সাহিত্যসম্বন্ধে কিছু বলা যাইতে পারে। তাহা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। কেননা যদিচ প্রথম নম্বরেই আমার লেখাটাকেই সেসনে সোপরদ্দ করা হইয়াছে তবু এ খবরটারও আভাস আছে যে আজকালকার প্রায় সকল লেখকেরই এই একই অপরাধ।

বাস্তবতা না থাকা নিশ্চয়ই একটা মস্ত ফাঁকি। বস্তু কিছুই পাইল না অথচ দাম দিল এবং খুসি হইয়া হাসিতে হাসিতে গেল এমন সব হতবুদ্ধি লোকের জন্য পাকা অভিভাবক নিযুক্ত হওয়া উচিত। সেই লোকেই অভিভাবকের উপযুক্ত, কবিরা ফস্ করিয়া যাহাদিগকে কলাকৌশলে ঠকাইতে না পারে,—কটাক্ষে যাহারা বুঝিতে পারে বস্তু কোথায় আছে এবং কোথায় নাই। অতএব যাঁহারা অবাস্তব-সাহিত্যসম্বন্ধে দেশকে সতর্ক করিয়া দিতেছেন, তাঁহারা নাবালক ও নালায়েক পাঠকদের জন্য কোর্ট্ অফ্ ওয়ার্ডস্ খুলিবার কাজ করিতেছেন।

কিন্তু সমালোচক যত বড় বিচক্ষণ হোন না কেন চিরকালই তাঁহারা পাঠকদের কোলে তুলিয়া সাম্‌লাইবেন সেটা ত ধাত্রী এবং ধৃত কাহারো পক্ষে ভালো নয়। পাঠকদিগকে স্পষ্ট করিয়া সমজাইয়া দেওয়া উচিত কোন্‌টা বস্তু এবং কোন্‌টা বস্তু নয়।

মুস্কিল এই যে, বস্তু একটা নহে এবং সব জায়গায় আমরা একই বস্তুর তত্ত্ব করি না। মানুষের বহুধা প্রকৃতি, তাহার প্রয়োজন নানা, এবং বিচিত্র বস্তুর সন্ধানে তাহাকে ফিরিতে হয়।

এখন কথা এই, সাহিত্যের মধ্যে কোন্ বস্তুকে আমরা খুঁজি। ওস্তাদেরা বলিয়া থাকেন সেটা রস-বস্তু। বলা বাহুল্য এখানে রস-

সাহিত্যের কথাই হইতেছে। এই রসটা এমন জিনিষ, যাহার বাস্তবতা সম্বন্ধে তর্ক উঠিলে হাতাহাতি পর্য্যন্ত গড়ায় এবং একপক্ষ অথবা উভয়পক্ষ ভূমিসাৎ হইলেও কোনো মীমাংসা হয় না।

রস জিনিষটা রসিকের অপেক্ষা রাখে, কেবলমাত্র নিজের জোরে নিজেকে সে সপ্রমাণ করিতে পারে না। সংসারে বিদ্বান, বুদ্ধিমান, দেশহিতৈষী, লোকহিতৈষী প্রভৃতি নানা প্রকারের ভালো ভালো লোক আছেন কিন্তু দময়ন্তী যেমন সকল দেবতাকে ছাড়িয়া নলের গলায় মালা দিয়াছিলেন তেমনি রস-ভারতী স্বয়ম্বর-সভায় আর সকলকেই বাদ দিয়া কেবল রসিকের সন্ধান করিয়া থাকেন।

সমালোচক বুক ফুলাইয়া তাল ঠুকিয়া বলেন, আমিই সেই রসিক। প্রতিবাদ করিতে সাহস হয় না কিন্তু অরসিক আপনাকে অরসিক বলিয়া জানিয়াছে সংসারে এই অভিজ্ঞতাটা দেখা যায় না। আমার কোন্‌টা ভালো লাগিল এবং আমার কোন্‌টা ভালো লাগিল না সেইটেই যে রসপরীক্ষার চূড়ান্ত মীমাংসা, পনেরো আনা লোক সে সম্বন্ধে নিঃসংশয়। এই জন্যই সাহিত্য-সমালোচনায় বিনয় নাই। মূলধন না থাকিলেও দালালীর কাজে নামিতে কাহারো বাধে না তেমনি সাহিত্যসমালোচনায় কোনো প্রকার পুঁজির জন্য কেহ সবুর করে না। কেননা সমালোচকের পদটা সম্পূর্ণ নিরাপদ।

সাহিত্যের যাচাই-ব্যাপারটা এতই যদি অনিশ্চিত, তবে সাহিত্য যাহারা রচনা করে তাহাদের উপায় কি? আশু উপায় দেখি না। অর্থাৎ তাহারা যদি নিশ্চিত ফল জানিতে চায় তবে সেই জানিবার ভরাৎ তাহাদের প্রপৌত্রের উপর দিতে হয়। নগদ-বিদায় যেটা তাহাদের ভাগ্যে জোটে সেটার উপর অত্যন্ত ভর দেওয়া চলিবে না।

রস-বিচারে ব্যক্তিগত এবং কালগত ভুল সংশোধন করিয়া লইবার জন্য বহু ব্যক্তি ও দীর্ঘ সময়ের ভিতর দিয়া বিচার্য্য পদার্থটিকে বহিয়া লইয়া গেলে তবে সন্দেহ মেটে।

কোনো কবির রচনার মধ্যে সাহিত্য-বস্তুটা আছে কি না তাহার উপযুক্ত সমজদার, কবির সমসাময়িকদের মধ্যে নিশ্চয়ই অনেক আছে কিন্তু তাহারাই উপযুক্ত কি না তাহার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি দাবী করিলে ঠকা অসম্ভব নয়।

এমন অবস্থায় লেখকের একটা সুবিধা আছে এই যে, তাঁহার লেখা যে-লোক পছন্দ করে সেই যে সমজদার তাহা ধরিয়া লইতে বাধা নাই। অপরপক্ষকে তিনি যদি উপযুক্ত বলিয়া গণ্যই না করেন তবে এমন বিচারালয় হাতের কাছে নাই যেখানে তাহারা নালিশ রুজু করিতে পারে। অবশ্য কালের আদালতে ইহার বিচার চলিতেছে কিন্তু সেই দেওয়ানী আদালতের মত দীর্ঘসূত্রী আদালত ইংরেজের মুল্লুকেও নাই। এস্থলে কবিরই জিত রহিল, কেননা আপাতত দখল যে তাহারই। কালের পেয়াদা যেদিন তাহার খ্যাতি-সীমানার খুঁটি উপড়াইতে আসিবে সেদিন সমালোচক সেই তামাসা দেখিবার জন্য সবুর করিতে পারিবে না।

যাঁহারা আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে বাস্তবতার তল্লাস করিয়া একেবারে হতাশ্বাস হইয়া পড়িয়াছেন তাঁহারা আমার কথার উত্তরে বলিবেন—"দাঁড়িপাল্লায় চড়াইয়া রস-জিনিষটার বস্তু-পরিমাণ করা যায় না একথা সত্য কিন্তু রস-পদার্থ কোনো একটা বস্তুকে আশ্রয় করিয়া ত প্রকাশ পায়। সেইখানেই আমরা বাস্তবতার বিচার করিবার সুযোগ পাইয়া থাকি।"

নিশ্চয়ই রসের একটা আধার আছে। সেটা মাপকাঠির আয়ত্তাধীন সন্দেহ নাই। কিন্তু সেইটেরই বস্তু-পিণ্ড ওজন করিয়া কি সাহিত্যের দর যাচাই হয় ?

রসের মধ্যে একটা নিত্যতা আছে। মান্ধাতার আমলে মানুষ যে রসটি উপভোগ করিয়াছে আজও তাহা বাতিল হয় নাই। কিন্তু বস্তুর দর বাজার-অনুসারে এবেলা ওবেলা বদল হইতে থাকে।

আচ্ছা মনে করা যাক কবিতাকে বাস্তব করিবার লোভ আমি আর সামলাইতে পারিতেছি না। খুঁজিতে লাগিলাম দেশে সব চেয়ে কোন্ ব্যাপারটা বাস্তব হইয়া উঠিয়াছে। দেখিলাম ব্রাহ্মণ-সভাটা দেশের মধ্যে রেলোয়ে-সিগ্নালের স্তম্ভটার মত চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া আপনার একটিমাত্র পায়ে ভর দিয়া খুব উঁচু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কায়স্থেরা পৈতা লইবেই আর ব্রাহ্মণ-সভা তাহার পৈতা কাড়িবে এই ঘটনাটা বাংলা দেশে বিশ্ব-ব্যাপারের মধ্যে সব চেয়ে বড়। অতএব বাঙালী কবি যদি ইহাকে তাহার রচনায় আমল না দেয় তবে বুঝিতে হইবে বাস্তবতা সম্বন্ধে তাহার বোধ-শক্তি অত্যন্ত ক্ষীণ। এই বুঝিয়া লিখিলাম পৈতা-সংহার-কাব্য। তাহার বস্তু-পিণ্ডটা ওজনে কম হইল না কিন্তু হায়রে, সরস্বতী কি বস্তু-পিণ্ডের উপরে তাঁহার আসন রাখিয়াছেন, না পদ্মের উপরে ?

এই দৃষ্টান্তটি দিবার একটু হেতু আছে। বিচারকদের মতে বাস্তবতা জিনিষটা কি, তাহার একটা সূত্র ধরিতে পারিয়াছি। আমার বিরুদ্ধে একজন ফরিয়াদী বলিয়াছেন, আমার সমস্ত রচনার মধ্যে বাস্তবতার উপকরণ একটু যেখানে জমা হইয়াছে সে কেবল "গোরা" উপন্যাসে।

গোরা উপন্যাসে কি বস্তু আছে না আছে উক্ত উপন্যাসের লেখক

তাহা সব চেয়ে কম বোঝে। লোকমুখে শুনিয়াছি প্রচলিত হিঁদুয়ানির ভালো ব্যাখ্যা তাহার মধ্যে পাওয়া যায়। ইহা হইতে আন্দাজ করিতেছি ওটাই একটা বাস্তবতার লক্ষণ।

বর্ত্তমান সময়ে কতকগুলি বিশেষ কারণে হিন্দু আপনার হিন্দুত্ব লইয়া ভয়ঙ্কর রুখিয়া উঠিয়াছে। সেটা সম্বন্ধে তাহার মনের ভাব বেশ সহজ অবস্থায় নাই। বিশ্ব-রচনায় এই হিন্দুত্বই বিধাতার চরম কীর্ত্তি এবং এই সৃষ্টিতেই তিনি তাঁহার সমস্ত শক্তি নিঃশেষ করিয়া আর কিছুতেই অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না এইটে আমাদের বুলি। সাহিত্যের বাস্তবতা ওজনের সময়ে এই বুলিটা হয় বাটখারা। কালিদাসকে আমরা ভালো বলি, কেননা, তাঁহার কাব্যে হিন্দুত্ব আছে। বঙ্কিমকে আমরা ভালো বলি, কেননা, স্বামীর প্রতি হিন্দু রমণীর যেরূপ মনোভাব হিন্দুশাস্ত্রসম্মত তাহা তাঁহার নায়িকাদের মধ্যে দেখা যায়, অথবা নিন্দা করি সেটা যথেষ্ট পরিমাণে নাই বলিয়া।

অন্য দেশেও এমন ঘটে। ইংলণ্ডে ইম্পীরিয়ালিজমের জ্বরোত্তাপ যখন ঘণ্টায় ঘণ্টায় চড়িয়া উঠিতেছিল তখন একদল ইংরেজ কবির কাব্যে তাহারই রক্তবর্ণ বাস্তবতা প্রলাপ বকিতেছিল।

তাহার সঙ্গে যদি তুলনা করা যায় তবে ওয়ার্ডস্বার্থের কবিতায় বাস্তবতা কোথায়? তিনি বিশ্ব-প্রকৃতির মধ্যে যে একটি আনন্দময় আবির্ভাব দেখিতে পাইয়াছিলেন তাহার সঙ্গে ব্রিটিশ জনসাধারণের শিক্ষা-দীক্ষা-অভ্যাস-আচার-বিচারের যোগ ছিল কোথায়? তাঁহার ভাবের রাগিণীটি নির্জ্জনবাসী একলা-কবির চিত্ত-বাঁশীতে বাজিয়াছিল— ইংরেজের স্বদেশী হাটে ওজন-দরে যাহা বিক্রি হয় এমনতর বস্তু-পিণ্ড তাহার মধ্যে কি আছে জানিতে চাই।

আর কীট্‌স্, শেলি,—ইঁহাদের কাব্যের বাস্তবতা কি দিয়া নির্দ্ধারণ করিব? ইংরেজের জাতীয় চিত্তের সুরের সঙ্গে সুর মিলাইয়া কি ইঁহারা বক্‌শিষ ও বাহবা পাইয়াছিলেন? যে সমস্ত সমালোচক সাহিত্যের হাটে বাস্তবতার দালালী করিয়া থাকেন তাঁহারা ওয়ার্ড-স্বার্থের কবিতার কিরূপ সমাদর করিয়াছিলেন তাহা ইতিহাসে আছে। শেলিকে অস্পৃশ্য অন্ত্যজের মত তাঁহার দেশ সেদিন ঘরে ঢুকিতে দেয় নাই এবং কীট্‌স্‌কে মৃত্যুবাণ মারিয়াছিল।

আরো আধুনিক দৃষ্টান্ত টেনিসন্। তিনি ভিক্টোরীয় যুগের প্রচলিত লোকধর্ম্মের কবি। তাই তাঁহার প্রভাব দেশের মধ্যে সর্ব্বব্যাপী ছিল। কিন্তু ভিক্টোরীয় যুগের বাস্তবতা যত ক্ষীণ হইতেছে টেনিসনের আসনও তত সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিতেছে। তাঁহার কাব্য যে গুণে টিঁকিবে তাহা নিত্য-রসের গুণে, তাহাতে ভিক্টোরীয় ব্রিটিশ-বস্তু বহুল পরিমাণে আছে বলিয়া নহে;—সেই স্থূল বস্তুটাই প্রতিদিন ধসিয়া পড়িতেছে।

আমাদের কালের লেখকদের মোটা অপরাধটা এই যে, আমরা ইংরেজি পড়িয়াছি। ইংরেজি শিক্ষা বাঙালীর পক্ষে বাস্তব নহে অতএব তাহা বাস্তবতার কারণও নহে, আর সেই জন্যই এখনকার সাহিত্য, দেশের লোকসাধারণকে শিক্ষা ও আনন্দ দিতে পারে না।

উত্তম কথা—কিন্তু দেশের যে-সব লোক ইংরেজি শেখে নাই তাহাদের তুলনায় আমাদের সংখ্যা ত নগণ্য। কেহ তাহাদের ত কলম কাড়িয়া লয় নাই। আমরা কেবল আমাদের অবাস্তবতার জোরে দেশের সমস্ত বাস্তবিকদের চেয়ে জিতিয়া যাইব ইহা স্বভাবের নিয়ম নহে।

হয় ত উত্তরে শুনিব আমরা হারিতেছি। ইংরেজি যাহারা শেখে নাই তাহারাই দেশের বাস্তব-সাহিত্য সৃষ্টি করিতেছে, তাহাই টিঁকিবে এবং তাহাতেই লোকশিক্ষা হইবে।

তাই যদি হয় তবে আর ভাবনা কিসের? বাস্তব-সাহিত্যের বিপুল ক্ষেত্র ও আয়োজন দেশ জুড়িয়া রহিয়াছে তাহার মধ্যে ছিটাফোঁটা অবাস্তব মুহূর্ত্তকালও টিঁকিতে পারিবে না।

কিন্তু সেই বৃহৎ বাস্তব-সাহিত্যকে চোখে দেখিলে কাজে লাগিত, একটা আদর্শ পাওয়া যাইত। যতক্ষণ তাহার পরিচয় নাই ততক্ষণ যদি গায়ের জোরে তাহাকে মানিয়া লই তবে সেটা বাস্তবিক হইবে না, কাল্পনিক হইবে।

অথচ এদিকে ইংরেজি-পোড়োরা যে সাহিত্য সৃষ্টি করিল, রাগিয়া তাহাকে গালি দিলেও সে বাড়িয়া উঠিতেছে; নিন্দা করিলেও তাহাকে অস্বীকার করিবার জো নাই। ইহাই বাস্তবের প্রকৃত লক্ষণ। এই যে কোনো কোনো মানুষ খামখা রাগিয়া ইহাকে উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে তাহারও কারণ, এ স্বপ্ন নয়, মায়া নয়, এ বাস্তব। দেখ নাই কি, এংলো-ইণ্ডিয়ান কাগজরা কথায় কথায় বলিয়া থাকে ভারতবর্ষের মধ্যে বাঙালী জাতটা গণ্যই নহে? তাহাদের কথার ঝাঁজ দেখিলেই বুঝা যায় তাহারা বাঙালীকেই বিশেষভাবে গণ্য করিয়াছে, কোনো মতেই ভুলিতে পারিতেছে না।

ইংরেজি শিক্ষা সোনার কাঠির মত আমাদের জীবনকে স্পর্শ করিয়াছে, সে আমাদের ভিতরকার বাস্তবকেই জাগাইল। এই বাস্তবকে যে লোক ভয় করে, যে লোক বাঁধা-নিয়মের শিকলটাকেই শ্রেয় বলিয়া জানে তাহারা, ইংরেজই হউক্ আর বাঙালীই হউক,

এই শিক্ষাকে ভ্রম এবং এই জাগরণকে অবাস্তব বলিয়া উড়াইয়া দিবার ভান করিতে থাকে। তাহাদের বাঁধা তর্ক এই যে, এক দেশের আঘাত আর-এক দেশকে সচেতন করে না। কিন্তু দূর দেশের দক্ষিণে হাওয়ায় দেশান্তরে সাহিত্যকুঞ্জে ফুলের উৎসব জাগাইয়াছে ইতিহাসে তাহার প্রমাণ আছে। যেখান হইতে যেমন করিয়াই হউক জীবনের আঘাতে জীবন জাগিয়া উঠে, মানব-চিত্ত-তত্ত্বে ইহা একটি চিরকালের বাস্তব ব্যাপার।

কিন্তু লোকশিক্ষার কি হইবে ?

সে কথার জবাবদিহি সাহিত্যের নহে।

লোক যদি সাহিত্য হইতে শিক্ষা পাইতে চেষ্টা করে তবে পাইতেও পারে কিন্তু সাহিত্য লোককে শিক্ষা দিবার জন্য কোনো চিন্তাই করে না। কোনো দেশেই সাহিত্য ইস্কুল-মাষ্টারির ভার লয় নাই। রামায়ণ মহাভারত দেশের সকল লোকে পড়ে তাহার কারণ এ নয় যে তাহা কৃষাণের ভাষায় লেখা বা তাহাতে দুঃখি-কাঙালের ঘরকর্‌নার কথা বর্ণিত। তাহাতে বড় বড় রাজা, বড় বড় রাক্ষস, বড় বড় বীর এবং বড় বড় বানরের বড় বড় ল্যাজের কথাই আছে। আগাগোড়া সমস্তই অসাধারণ। সাধারণ লোক আপনার গরজে এই সাহিত্যকে পড়িতে শিখিয়াছে।

সাধারণ লোক মেঘদূত, কুমারসম্ভব, শকুন্তলা পড়ে না। খুব সম্ভব দিঙ্‌নাগাচার্য্য এই ক'টা বইয়ের মধ্যে বাস্তবের অভাব দেখিয়াছিলেন। মেঘদূতের ত কথাই নাই। কালিদাস স্বয়ং এই বাস্তব-বাদীদের ভয়ে এক জায়গায় নিতান্ত অকবিজনোচিত কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন—কামার্ত্তা হি প্রকৃতিকৃপণাশ্চেতনাচেতনেষু।

আমি অকবিজনোচিত এইজন্য বলিতেছি যে, কবিমাত্রই চেতন-অচেতনের মিল ঘটাইয়া থাকেন, কেননা তাঁহারা বিশ্বের মিত্র, তাঁহারা ন্যায়ের অধ্যাপক নহেন; শকুন্তলার চতুর্থ অঙ্ক পড়িলেই সেটা বুঝিতে বাকি থাকিবে না।

কিন্তু আমি বলিতেছি যদি কালিদাসের কাব্য ভালো হয় তবে সমস্ত মানুষের জন্যই তাহা সকল-কালের ভাণ্ডারে সঞ্চিত রহিল, —আজকের সাধারণ মানুষ যাহা বুঝিল না কালকের সাধারণ মানুষ হয় ত তাহা বুঝিবে, অন্তত সেইরূপ আশা করি। কিন্তু কালিদাস যদি কবি না হইয়া লোক-হিতৈষী হইতেন তবে সেই পঞ্চম শতাব্দীর উজ্জয়িনীর কৃষাণদের জন্য হয় ত প্রাথমিক শিক্ষার উপযোগী কয়েকখানা বই লিখিতেন,—তাহা হইলে তারপর হইতে এতগুলা শতাব্দীর কি দশা হইত?

তুমি কি মনে কর লোক-হিতৈষী তখন কেহ ছিল না? লোক-সাধারণের নৈতিক ও জাঠরিক উন্নতি কি করিয়া হইতে পারে সে কথা ভাবিয়া কেহ কি তখন কোনো বই লেখে নাই? কিন্তু সে কি সাহিত্য? ক্লাসের পড়া শেষ হইলেই বৎসর-অন্তর ইস্কুলের বইয়ের যে দশা হয় তাহাদেরও সেই দশা হইয়াছে, অর্থাৎ স্বেদ-কম্প-রোমাঞ্চর ভিতর দিয়া একেবারেই দশম দশা।

যাহা ভালো তাহাকে পাইবার জন্য সাধনা করিতেই হইবে—রাজার ছেলেকেও করিতে হইবে, কৃষাণের ছেলেকেও। রাজার ছেলের সুবিধা এই যে তাহার সাধনা করিবার সময় আছে কৃষাণের ছেলের নাই। কিন্তু সেটা সামাজিক ব্যবস্থার তর্ক,—যদি প্রতিকার

করিতে পার, করিয়া দাও কাহারো আপত্তি হইবে না। তানসেন তাই বলিয়া মেঠো-সুর তৈরি করিতে বসিবেন না। তাঁহার সৃষ্টি আনন্দের সৃষ্টি, সে যাহা তাহাই; আর-কোনো মৎলবে সে আর-কিছু হইতে পারেই না। যাহারা রসপিপাসু তাহারা যত্ন করিয়া শিক্ষা করিয়া সেই ধ্রুপদগুলির নিগূঢ় মধুকোষের মধ্যে প্রবেশ করিবে। অবশ্য লোক-সাধারণ যতক্ষণ সেই মধুকোষের পথ না জানিবে ততক্ষণ তানসেনের গান তাহাদের কাছে সম্পূর্ণ অবাস্তব একথা মানিতেই হইবে। তাই বলিতেছিলাম কোথায় কোন্ বস্তুর খোঁজ করিতে হইবে, কেমন করিয়া খোঁজ করিতে হইবে, কে তাহার খোঁজ পাইবার অধিকারী, সেটা ত নিজের খেয়াল-মত এককথায় প্রমাণ বা অপ্রমাণ করা যায় না।

তবে কবিদের অবলম্বনটা কি? একটা-কিছুর পরে জোর করিয়া তাঁহারা ত ভর দিয়াছেন। নিশ্চয়ই দিয়াছেন। সেটা অন্তরের অনুভূতি এবং আত্মপ্রসাদ। কবি যদি একটি বেদনাময় চৈতন্য লইয়া জন্মিয়া থাকেন, যদি তিনি নিজের প্রকৃতি দিয়াই বিশ্ব-প্রকৃতি ও মানব-প্রকৃতির সহিত আত্মীয়তা করিয়া থাকেন, যদি শিক্ষা, অভ্যাস, প্রথা, শাস্ত্র প্রভৃতি জড় আবরণের ভিতর দিয়া কেবলমাত্র দশের নিয়মে তিনি বিশ্বের সঙ্গে ব্যবহার না করেন তবে তিনি নিখিলের সংস্রবে যাহা অনুভব করিবেন তাহার একান্ত বাস্তবতাসম্বন্ধে তাঁহার মনে কোনো সন্দেহ থাকিবে না। বিশ্ব-বস্তু ও বিশ্ব-রসকে একেবারে অব্যবহিত ভাবে তিনি নিজের জীবনে উপলব্ধি করিয়াছেন, এইখানেই তাঁহার জোর। পূর্ব্বেই বলিয়াছি বাহিরের হাটে বস্তুর দর কেবলই উঠা-নামা করিতেছে—সেখানে

নানা মুনির নানা মত, নানা লোকের নানা ফরমাস, নানা কালের নানা ফেশান্। বাস্তবের সেই হট্টগোলের মধ্যে পড়িলে কবির কাব্য হাটের কাব্য হইবে। তাঁহার অন্তরের মধ্যে যে ধ্রুব আদর্শ আছে তাহারই পরে নির্ভর করা ছাড়া অন্য উপায় নাই। সে আদর্শ হিন্দুর আদর্শ বা ইংরেজের আদর্শ নয়, তাহা লোকহিতের এবং ইস্কুল-মাষ্টারীর আদর্শ নহে। তাহা আনন্দময় সুতরাং অনির্ব্বচনীয়। কবি জানেন যেটা তাঁহার কাছে এতই সত্য সেটা কাহারো কাছে মিথ্যা নহে। যদি কাহারো কাছে তাহা মিথ্যা হয় তবে সেই মিথ্যাটাই মিথ্যা ;—যে লোক চোখ বুজিয়া আছে তাহার কাছে আলোক যেমন মিথ্যা, এও তেমনি মিথ্যা। কাব্যের বাস্তবতা সম্বন্ধে কবির নিজের মধ্যে যে প্রমাণ, তিনি জানেন বিশ্বের মধ্যেই সেই প্রমাণ আছে। সেই প্রমাণের অনুভূতি সকলের নাই—সুতরাং বিচারকের আসনে যে-খুসি বসিয়া যেমন-খুসি রায় দিতে পারেন কিন্তু ডিক্রিজারির বেলায় যে তাহা খাটিবেই এমন কোনো কথা নাই।

কবির আত্মানুভূতির যে উপাদানটার কথা বলিলাম এটা সকল কবির সকল সময়েই যে বিশুদ্ধ থাকে তাহা নহে। তাহা নানা কারণে কখনো আবৃত হয়, কখনো বিকৃত হয়, নগদ মূল্যের প্রলোভনে কখনো তাহার উপর বাজারে-চলিত-আদর্শের নকলে কৃত্রিম নক্সা কাটা হয়—এই জন্য তাহার সকল অংশ নিত্য নহে এবং সকল অংশের সমান আদর হইতেই পারে না। অতএব কবি রাগই করুন আর খুসিই হউন তাঁহার কাব্যের একটা বিচার করিতেই হইবে —এবং যে-কেহ তাঁহার কাব্য পড়িবে সকলেই তাঁহার বিচার

করিবে—সে বিচারে সকলে একমত হইবে না। মোটের উপরে যদি নিজের মনে তিনি যথার্থ আত্মপ্রসাদ পাইয়া থাকেন তবে তাঁহার প্রাপ্যটি হাতে হাতে চুকাইয়া লইয়াছেন। অবশ্য পাওনার চেয়ে উপরি-পাওনায় মানুষের লোভ বেশি। সেইজন্যই বাহিরে আশে-পাশে আড়ালে-আবডালে এত করিয়া হাত পাতিতে হয়। ঐখানেই বিপদ। কেননা লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বাংলা ছন্দ*

শান্তিনিকেতন
বোলপুর

প্রিয়বরেষু

এতদিন গ্রীষ্মের ছুটি ছিল; এখন আবার কাজে লাগিয়াছি। বাংলা ছন্দসম্বন্ধে আপনাকে আরো কিছু লিখিব আশা দিয়াছিলাম। কিন্তু যাহারা খাঁটি কুঁড়ে মানুষ, ফুর্‌সৎ পাইলেই তাহারা কোনো কাজ করিতে পারে না। সেই জন্য এতদিন ছুটির ভিড়ে আপনাকে লিখিতে পারি নাই। যখন নিয়মিত কাজের তাড়া পড়ে তখন কুঁড়ে মানুষরা একটা অনিয়মিত কাজ পাইলে বাঁচিয়া যায়—তাই আমার ইস্কুল পালাইয়া আপনাকে বাংলা ছন্দসম্বন্ধে চিঠি লিখিতে বসিয়া গেলাম।

"সম্মুখ সমরে পড়ি বীরচূড়ামণি
বীরবাহু,—"

এই বাক্যটি আবৃত্তি করিবার সময়ে আমরা "সম্মুখ" শব্দটার উপরে ঝোঁক দিয়া সেই এক-ঝোঁকে একেবারে "বীরবাহু" পর্য্যন্ত গড়গড় করিয়া চলিয়া যাইতে পারি। আমরা নিশ্বাসটার বাজে-খরচ করিতে নারাজ,—এক নিশ্বাসে যতগুলা শব্দ সারিয়া লইতে পারি ছাড়ি না।

আপনাদের ইংরাজি বাক্যে সেটা সম্ভব হয় না—কেননা আপনাদের শব্দগুলা বেজায় রোখা মেজাজের। তাহারা প্রত্যেকেই ঢুঁ মারিয়া

* এই পত্র কেম্ব্রিজের বাংলা-অধ্যাপক শ্রীযুক্ত এণ্ডার্সন সাহেবকে লিখিত।

নিশ্বাসের শাসন ঠেলিয়া বাহির হইতে চায়। She was absolutely authentic, new, and inexpressible,—এই বাক্যে যতগুলি বিশেষণপদ আছে সব কটাই উঁচু হইয়া উঠিয়া নিশ্বাসের বাতাসটাকে ফুটবলের গোলার মত এক মাথা হইতে আর এক মাথায় ছুঁড়িয়া ছুঁড়িয়া চালান করিয়া দিতেছে।

প্রত্যেক ভাষারই একটা স্বাভাবিক চলিবার ভঙ্গী আছে। সেই ভঙ্গীটারই অনুসরণ করিয়া সেই ভাষার নৃত্য অর্থাৎ তাহার ছন্দ রচনা করিতে হয়। এখন দেখা যাক্ আমাদের ভাষার চাল-চলনটা কি রকম।

আপনি বলিয়াছেন, বাংলা-বাক্য উচ্চারণে বাক্যের আরম্ভে আমরা ঝোঁক দিয়া থাকি। এই ঝোঁকের দৌড়টা যে কতদূর পর্য্যন্ত হইবে তাহার কোনো বাঁধা নিয়ম নাই,—সেটা আমাদের ইচ্ছা। যদি জোর দিতে না চাই তবে সমস্ত বাক্যটা একটানা বলিতে পারি—যদি জোর দিতে চাই তবে বাক্যের পর্ব্বে পর্ব্বেই ঝোঁক দিয়া থাকি। "আদিম মানবের তুমুল পাশবতা মনে করিয়া দেখ"—এই বাক্যটা আমরা এমনি করিয়া পড়িতে পারি যাহাতে উহার সকল শব্দই একেবারে মাথায় মাথায় সমান হইয়া থাকে। আবার উত্তেজনার বেগে নিম্নলিখিত মত করিয়াও পড়া যাইতে পারে,—আদিম মানবের তুমুল পাশবতা মনে করিয়া দেখ। এই বাংলা-শব্দগুলির নিজের কোনো বিশেষ দাবী নাই—আমাদের মর্জ্জির উপরেই নির্ভর। কিন্তু "Realize the riotous animality of primitive man"—এই বাক্যে প্রায় প্রত্যেক শব্দই নিজ-নিজ এক্‌সেণ্টের ধ্বজা গাড়িয়া বসিয়া আছে বলিয়া নিশ্বাস তাহাদিগকে খাতির করিয়া চলিতে বাধ্য।

বাংলা ছন্দে যে পদবিভাগ হয় সেই প্রত্যেক পদের গোড়াতেই একটি করিয়া ঝোঁকালো শব্দ কাপ্তেনি করে এবং তাহার পিছন পিছন কয়েকটি অনুগত শব্দ সমান-তালে পা ফেলিয়া কুচ করিয়া চলিয়া যায়। এইরূপ একএকটি ঝোঁক-কাপ্তেনের অধীনে কয়টা করিয়া মাত্রা-সিপাই থাকিবে ছন্দের নিয়ম-অনুসারে তাহার বরাদ্দ হইয়া থাকে।

পয়ারের রীতিটা দেখা যাক্। পয়ারটা চতুষ্পাদ ছন্দ। আমার বিশ্বাস, পয়ার শব্দটা পদ-চার শব্দের বিকার। ইহার এক-একটি পদ এক একটি ঝোঁকের শাসনে চলে।

মহাভারতের কথা ' অমৃত সমান '
কাশিরামদাস কহে ' শুনে পুণ্যবান '

"অমৃত সমান" ও "শুনে পুণ্যবান" এই দুই অংশে ছয়টি অক্ষর দেখা যাইতেছে বটে কিন্তু মাত্রাগণনায় ইহারা আট। ঐখানে লাইন শেষ হয় বলিয়া দুটি মাত্রা-পরিমাণ জায়গা ফাঁক থাকে। যাহারা সুর করিয়া পড়ে তাহারা "মান" এবং "বান" শব্দের আকারটিকে দীর্ঘাকার করিয়া ঐ ফাঁক ভরাইয়া দেয়।

একএকটি ঝোঁকে কয়টি করিয়া মাত্রা আগলাইতেছে তাহা দেখিয়াই ছন্দের বিচার করিতে হয়। নতুবা যদি মোটা করিয়া বলি যে, একএক লাইনে চোদ্দটা করিয়া অক্ষর থাকিলে তাহাকে পয়ার বলে তবে নানা ভিন্ন প্রকারের ছন্দকে পয়ার বলিতে হয়। নিম্নলিখিত ছন্দে প্রত্যেক লাইনে চোদ্দটা অক্ষর আছে :—

ফাগুন যামিনী, প্রদীপ জ্বলিছে ঘরে।
দখিন বাতাস মরিছে বুকের পরে।

ইহাকে যে পয়ার বলিনা তাহার কারণ ইহার একএকটি ঝোঁকের দখলে ছয়টি করিয়া মাত্রা। ইহার ভাগ নীচে লিখিলাম :—

ফাগুন-যামিনী ॥ প্রদীপ জ্বলিছে ॥ ঘরে— ॥

চোদ্দ-অক্ষরী লাইনের আরো দৃষ্টান্ত আছে —

পূরব মেঘমুখে ॥ পড়েছে রবি-রেখা ॥
অরুণ-রথচূড়া ॥ আধেক গেল দেখা ॥

এখানে স্পষ্টই একএক ঝোঁকে সাতটি করিয়া মাত্রা। সুতরাং পয়ারের তুলনায় প্রত্যেক পদে ইহার একমাত্রা কম।

তবেই দেখা যাইতেছে, আটমাত্রার ছন্দকেই পয়ার বলে। আট মাত্রাকে দুখানা করিয়া চারমাত্রায় ভাগ করা চলে কিন্তু সেটাতে পয়ারের চাল খাটো করা হয়। বস্তুত লম্বা নিশ্বাসের মন্দগতি চালেই পয়ারের পদমর্য্যাদা। চার চার মাত্রায় পা ফেলিয়া পয়ার যখন দুল্‌কি চালে চলে তখন তাহার পায়ে পায়ে মিল থাকে। যেমন—

বাজে তীর, পড়ে বীর ধরণীর পরে।

এরূপ ছন্দ হাল্‌কা কাজে চলে, ইহা যুক্ত-অক্ষরের ভার সয় না এবং সাতকাণ্ড বা অষ্টাদশ পর্ব্ব জুড়িয়া লম্বা দৌড় ইহার পক্ষে অসাধ্য। চৌপদীটা পয়ারের সহোদর বোন্। আটমাত্রায় তাহার পা পড়ে—কেবল তাহার পায়ে মিলের মল-জোড়ার ঝঙ্কারটা কিছু বেশি।

বাহিরের চেহারা দেখিয়া ছন্দের জাতিনির্ণয় করায় যে প্রমাদ ঘটিতে পারে তাহার একটা দৃষ্টান্ত এইখানে দিই।

একদিন আমার মাথায় একটা ছয়মাত্রার ছন্দ আসিয়া হাজির হইয়াছিল। তাহার চেহারাটা এই রকম—

প্রথম শীতের মাসে, শিশির লাগিল ঘাসে,
হুহু করে হাওয়া আসে, হিহি করে কাঁপে গাত্র।

গোটাকয়েক শ্লোক যখন লেখা হইয়া গেছে তখন হঠাৎ হুঁস হইল যে আকারে আয়তনে চৌপদীর সঙ্গে ইহার কোনো তফাৎ নাই অতএব পাঠকেরা আটমাত্রার ঝোঁক দিয়াই ইহা পড়িবে—তখন আমি হাল ছাড়িয়া দিয়া চৌপদীর দস্তুরেই লিখিতে লাগিলাম। এই ছন্দটিকে ছয়মাত্রার কায়দায় পড়িতে হইলে নিম্নলিখিত মত ভাগ হয়ঃ—

প্রথম শীতের । মাসে— ।
শিশির লাগিল । ঘাসে— ।

আমাদের দেশের সঙ্গীতের তাল যদি আপনার জানা থাকে তবে এককথায় বলিলেই বুঝিবেন চৌপদীতে কাওয়ালির লয়ে ঝোঁক দিতে হয় এবং আমি যে ছন্দটা লক্ষ্য করিয়া লিখিতেছিলাম তাহার তাল একতালা। কাওয়ালি দুইবর্গ মাত্রার তাল, এবং একতালা তিন-বর্গ মাত্রার।

ত্রিপদীরও মোটের উপর আটমাত্রার চাল। যথা—

ভবানীর কটুভাবে । লজ্জা হৈল কৃত্তিবাসে ।
ক্ষুধানলে কলেবর । দহে ।

তৃতীয় পদে দুটামাত্রা বেশি আছে, তাহার কারণ, যে চতুর্থ পদটি থাকিলে এই ছন্দের ভার-সামঞ্জস্য থাকিত সেটি নাই। "ক্ষুধানলে

কলেবর” পর্য্যন্ত আসিয়া থামিতে গেলে ছন্দটা কাৎ হইয়া পড়ে এই জন্য “দহে” একটা যোগ করিয়া ছোট একটি ঠেকা দিয়া উহাকে খাড়া রাখা হইয়াছে। চতুষ্পদ জন্তুর পায়ের তেলোটা চওড়া হয় না, কিন্তু মানুষের খাড়া শরীরের টল-টলে ভারটা দুই পায়ের পক্ষে বেশি হওয়াতেই তাহার পদতলটা গোড়ালি ছাড়াইয়া সাম্‌নের দিকে খানিক্‌টা বিস্তীর্ণ; সেইটুকুই ত্রিপদীর ঐ শেষ দুটো অতিরিক্ত মাত্রা।

এইরূপ অনেকগুলি ছন্দ দেখা যায় যাহাতে খানিকটাকরিয়া বড় মাত্রাকে একটিকরিয়া ছোট মাত্রা দিয়া বাধা দিবার কায়দা দেখা যায়। দশ মাত্রার ছন্দ তাহার দৃষ্টান্ত—ইহার ভাগ আট + দুই, অথবা, চার + চার + দুই।

মোর পানে | চাহ মুখ | তুলি |
পরশিব | চরণের | ধুলি |

ছয়মাত্রার ছন্দেও এরূপ বড়-ছোটোর ভাগ চলে। সেই ভাগ ছয় + দুই, অথবা, তিন + তিন + দুই। যেমন—

আঁখিতে | মিলিল | আঁখি |
হাসিল | বদন | ঢাকি |
মরম-বারতা সরমে মরিল
কিছু না রহিল বাকি।

উক্ত ছন্দে তিনের দল বুক ফুলাইয়া জুড়ি মিলাইয়া চলিতেছিল, —হঠাৎ মাঝে মাঝে একটা খাপছাড়া দুই আসিয়া তাহাদিগকে বাধা দিয়াছে। এইরূপে গতি ও বাধার মিলনে ছন্দের সঙ্গীত একটু বিশেষভাবে বাজিয়া উঠিয়াছে। এই বাধাটি গতির অনুপাতে ছোট

হওয়া চাই। কারণ, বড় হইলে সে বাধা সত্য হয় এবং গতিকে আবদ্ধ করে, সেটা ছন্দের পক্ষে দুর্ঘটনা। তাই উপরের দুইটি দৃষ্টান্তে দেখিয়াছি চারের দল ও তিনের দলকে দুই আসিয়া রোধ করিয়াছে,—সেই জন্য ইহা বন্ধনের অবরোধ নহে, ইহা লীলার উপরোধ। দুইয়ের পরিবর্ত্তে এক হইলেও ক্ষতি হয় না।

যেমন—

প্রতিদিন হায় | এসে ফিরে যায় | কে ?

অথবা,

মুখে তার | নাহি আর | রা।
লাজে লীন | কাঁপে ক্ষীণ | গা।

বাংলা ছন্দকে তিন প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। দুই বর্গের মাত্রা, তিন বর্গের মাত্রা এবং অসমান মাত্রার ছন্দ।

দুই বর্গ মাত্রার ছন্দ, যেমন পয়ার, ত্রিপদী, চৌপদী। এই সমস্ত ছন্দ বড় বড় বোঝা বহিতে পারে, কেননা দুই, চার, আট মাত্রাগুলি বেশ চৌকা। এই জন্য পৃথিবীতে পা-ওয়ালা জীবমাত্রেরই, হয় দুই, নয় চার, নয় আট পা। বাংলা-সাহিত্যে ইহারাই মহাকাব্যের বাহন।

চাকার গুণ এই যে একবার ধাক্কা পাইলে সেই ঝোঁকে সে গড়াইয়া চলে, থামিতে চায় না। তিন মাত্রার ছন্দ সেই চাকার মত। দুই সংখ্যাটা স্থিতিপ্রবণ, তিন সংখ্যাটা গতিপ্রবণ।

নবীন | কিশোরী | মেঘের | বিজুরী | চমকি | চলিয়া | গেল ॥

এখানে তিন মাত্রার শব্দগুলি একটা আর-একটার গায়ের উপর

গড়াইয়া পড়িয়া ঠেলা দিয়া চলিয়াছে—থামানো দায়। অবশেষে একটি দুইমাত্রা আসিয়া তাহাকে ক্ষণকালের জন্য ঠেকাইয়াছে।

দুই মাত্রার সঙ্গে তিনমাত্রার মিলনে অসম-মাত্রার ছন্দের উৎপত্তি। ৩+২, ৩+৪, ৫+৪ মাত্রার ছন্দ তাহার দৃষ্টান্ত।

৩+২, যথা,—

কাঁপিলে পাতা, নড়িলে পাখী
চমকি উঠে চকিত আঁখি।

৩+৪

তরল জলধর বরিখে ঝরঝর
অশনি গরগর হাঁকে।

৫+৪

বচন বলে আধো-আধো,
চরণ চলে বাধো-বাধো,
নয়ন তলে কাঁদো-কাঁদো চাহনী।

তিন মাত্রার ছন্দের ন্যায় অসম-মাত্রার ছন্দও স্বভাবত চঞ্চল। মাত্রার অসমানতাই তাহাকে কেবল টলাইতে থাকে। প্রত্যেক পদ পরবর্ত্তী পদের উপর ঠেস দিয়া আপনাকে সামলাইতে চেষ্টা করে। বস্তুত তিনমাত্রাও অসম-মাত্রা, তাহার উপাদান দুই+এক।

কারণ ছন্দের মূল মাত্রা দুই, তাহা এক নহে। নিয়মিত গতিমাত্রই দুই সংখ্যাকে অবলম্বন করিয়া। তাই স্তম্ভ, যাহা থামিয়া থাকে, তাহা এক হইতে পারে, কিন্তু জন্তুর পা বল, পাখীর পাখা বল, মাছের পাখনা বল, দুইয়ের যোগে তবে চলে। সেই দুইয়ের নিয়মিত গতির উপরে যদি একটা একের অতিরিক্ত ভার চাপানো যায় তবে সেই গতিতে একটা অনিয়মের বেগ পড়ে—সেই

অনিয়মের ঠেলায় নিয়মিত গতির বেগ বাড়িয়া যায় এবং তাহার বৈচিত্র্য ঘটে। মানুষের শরীর তাহার দৃষ্টান্ত। চারপেয়ে মানুষ যখন সোজা হইয়া দাঁড়াইল তখন তাহার কোমর হইতে মাথা পর্য্যন্ত টলমলে এবং কোমর হইতে পদতল পর্য্যন্ত মজবুৎ হওয়াতে এই দুইভাগের মধ্যে অসামঞ্জস্য ঘটিয়াছে। এই অসামঞ্জস্যকে ছন্দে সামলাইবার জন্য মানুষের গতিতে মাথা হাত কোমর পা বিচিত্র হিল্লোলে হিল্লোলিত হইতেছে। চার পায়ের ছন্দ ইহার চেয়ে অনেক সরল।

অতএব বাংলা ছন্দকে সমমাত্রা, অসমমাত্রা এবং বিষমমাত্রায় শ্রেণীবদ্ধ করা যাইতে পারে। শুধু বাংলা কেন, কোনো ভাষার ছন্দের আর কোনো প্রকার ভাগ হইতে পারে বলিয়া মনে করিতে পারিনা। তবে প্রভেদ হয় কিসে? মাত্রাগুলির চেহারায়।

সংস্কৃত ভাষায় অসমান স্বর ও ব্যঞ্জনগুলিকে কৌশলে মিলাইয়া সমান মাত্রায় ভাগ করিতে হয়, তাহাতে ধ্বনির বৈচিত্র্য ও গাম্ভীর্য্য ঘটে। যথা—

বদসি যদি | কিঞ্চিদপি | দন্তরুচি | কৌমুদী।
হরতি দর | তিমির মতি | ঘোরং।

ইহা পাঁচমাত্রা অর্থাৎ বিষমমাত্রার ছন্দ। বাঙালি জয়দেব তাঁহার গানে সংস্কৃত ভাষার যুক্তবর্ণের বেণী যথাসম্ভব এলাইয়া দিতে ভালবাসিতেন এই জন্য উপরের উদ্ধৃত শ্লোকাংশটি যথেষ্ট ভালো দৃষ্টান্ত নহে—তবু ইহাতে আমার কথাটি বুঝা যাইবে। ইহার প্রত্যেক ঝোঁকে যে পাঁচমাত্রা পড়িয়াছে তাহার ভাগ এইরূপ :—

১+১+১+১+১ | ২+১+১+১ | ২+১+১+১ | ২+১+২ |

১+১+১+১+১ | ১+১+১+১+১ | ২+২+ — |

বাংলাভাষার সাধুছন্দে একের মাঝে মাঝে দুই বসিবার জায়গা পায় না একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। উপরের কবিতাটুকু বাংলায় তর্জ্জমা করিতে হইলে নিম্নলিখিত মত হইবে :—

বচন যদি | কহগো ছুটি।
দশন রুচি | উঠিবে ফুটি।
ঘুচাবে মোর | মনের ঘোর | তামসী।

একটি ইংরাজি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক্—

Ah distinctly | I remember |
It was in the | bleak December, | —

এটি চৌপদী ছন্দ। ইহার মাত্রাগুলিকে ছাড়াইয়া দেখা যাক্—

১ ২ ৩ ৪
Ah dis tinct ly

১ ২ ৩ ৪
I re mem ber

ইহার একএকটা ঝোঁকে চারিটি করিয়া মাত্রা,—কিন্তু অসমান শব্দগুলিকে ভাগ করিয়া এই মাত্রাগুলি তৈরি হইয়াছে এবং distinct শব্দের tinct এবং remember শব্দের mem অংশটি নিজের এক্‌সেণ্টের সড়্‌কি আস্ফালন করিতেছে।

ইহাই সাধুবাংলায় হইবে—

আহা মোর মনে আসে
দারুণ শীতের মাসে—

ইংরেজ কবি ইচ্ছা করিলেও এমনতর নখদন্তহীন মাত্রায় ছন্দ রচিতেই পারেন না কারণ তাঁহাদের শব্দগুলি কোণ-ওয়ালা।

ইচ্ছা করিলে যুক্ত-অক্ষরের আমদানি করিয়া আমরা ঐ শ্লোকটাকে শক্ত করিয়া তুলিতে পারি। যেমন—

স্পষ্ট স্মৃতি চিত্তে ভাসে
দুরন্ত অঘ্রাণ মাসে
অগ্নিকুণ্ড নিবে আসে
নাচে তারি উপচ্ছায়া।

এখানে বাংলার সঙ্গে ইংরাজির প্রধান প্রভেদ এই যে, বাংলা শব্দগুলিতে স্বরবর্ণের টান ইংরাজির চেয়ে বেশি। কিন্তু আমার প্রথম পত্রেই লিখিয়াছি সেটা কেবল সাধুভাষায়;—বাংলার চল্‌তি ভাষায় ঠিক ইহার উল্টা। চল্‌তি ভাষার কথাগুলি শুচিভাবে পরস্পরের স্পর্শ বাঁচাইয়া চলে না—ইংরাজি শব্দেরই মত চলিবার সময় কে কাহার গায়ে পড়ে তাহার ঠিক নাই।

পূর্ব্বপত্রেই লিখিয়াছি বাংলা চল্‌তি ভাষার ধ্বনিটা হসন্তের সংঘাতধ্বনি—এই জন্য ধ্বনিহিসাবে সংস্কৃতের চেয়ে ইংরাজির সঙ্গে তাহার মিল বেশি। তাই এই চল্‌তি ভাষার ছন্দে মাত্রাবিভাগ বিচিত্র। বাংলা প্রাকৃতের একটা চৌপদী নীচে লিখিলাম :—

কই পালঙ্ক, কইরে কম্বল,
কপ্‌নি-টুক্‌রো রইল সম্বল,
একলা পাগ্‌লা ফির্‌বে জঙ্গল
মিট্‌বে সঙ্কট ঘুচ্‌বে ধন্দ।

ইহার সঙ্গে Ah distinctly I remember শ্লোকটি মিলাইয়া দেখিলে দেখা যাইবে ধ্বনির বিশেষ কোনো তফাৎ নাই।

ইহার সাধু পাঠ এইরূপ :—

শয্যা কই বস্ত্র কই
কি আছে কৌপীন বই
একা বনে ফিরে ঐ
নাহি মনে ভয় চিন্তা।

সাধু ও অসাধুর মাত্রাভাগ নীচেনীচে লিখিলাম মিলাইয়া দেখিবেন :—

১ ২ ৩ ৪ ১ ২ ৩ ৪
কই | পা | লঙ্ | ক ‖ কই | রে | কম্ | বল্ ‖
শ | য্যা | ক | ই ‖ বস্ | ত্র | ক | ই ‖

১ ২ ৩ ৪ ১ ২ ৩ ৪
কপ্ | নি | টুক্ | রো ‖ রই | ল | সম্ | বল্ ‖
কি | আ | ছে | কৌ ‖ পী | ন | ব | ই ‖

১ ২ ৩ ৪ ১ ২ ৩ ৪
এক্ | লা | পাগ্ | লা ‖ ফির্ | বে | জঙ্ | গল্ ‖
এ | কা | ব | নে ‖ ফি | রে | ও | ই ‖

সাধুভাষার ছন্দটি যেন মোটা মোটা ফাঁকওয়ালা জালের মত—আর অসাধুটির একেবারে ঠাসবুনানি।

ইংরাজিতে সমমাত্রার ছন্দ অনেক আছে তাহার একটি দৃষ্টান্ত পূর্ব্বেই দিয়াছি। অসমমাত্রা অর্থাৎ তিনমাত্রার দৃষ্টান্ত, যথা :—

১ ২ ৩ ১ ২ ৩
One | more | un ‖ for | tu | nate ‖
১ ২ ৩ ১ ২ ৩
Wea | ry | of ‖ breath— — ‖

ইংরেজিতে বিষমমাত্রার একটি উদাহরণ দিতে পারিলেই আপাতত আমার পালা শেষ হয়। একটি মনে পড়িতেছে :—

১ ২ ৩ ৪ ৫
When | we | two | par | ted |

১ ২ ৩ ৪ ৫
(In) si | lence | and | tears | — |

১ ২ ৩ ৪ ৫
Half | bro | ken | heart | ed

১ ২ ৩ ৪ ৫
(To) se | ver | for | years | — |

এই শ্লোকটির দুই লাইনকে মিলাইয়া এক লাইন করিয়া পড়িলে ইহার ছন্দকে তিন মাত্রায় ভাগ করিয়া পড়া সহজ হয়। কিন্তু বিষমমাত্রার লয়ে ইহাকে পড়িলে চলে বলিয়াই এই দৃষ্টান্তটি প্রয়োগ করিয়াছি—বোধ করি এরূপ দৃষ্টান্ত ইংরেজি ছন্দে দুর্লভ।

দেখা গিয়াছে ইংরেজি ছন্দে ঝোঁক পদের আরম্ভেও পড়িতে পারে, পদের শেষেও পড়িতে পারে। আরম্ভে যেমন—

O the dreary | dreary moorland |

O the barren | barren shore |

পদের শেষে, যেমন,

And are ye sure || the news is true ||

And are ye sure || he's well ||

বাংলায় আরম্ভে ছাড়া পদের আর কোথাও ঝোঁক পড়িতে পারে না।

একলা পাগলা ফিরবে জঙ্গল

কিম্বা

একলা পাগলা ফিরবে জঙ্গল

এমনটি হইবার জো নাই।

আমার কথাটি ফুরালো। ইংরেজি ছন্দকে আমি বাংলা ছন্দের রীতি-অনুসারে ভাগ করিয়া দেখিয়াছি, সেটা ভালো হইল কিনা জানি না। ইংরেজি ছন্দতত্ত্ব আমার একদম জানা নাই বলিয়াই বোধ করি এরূপ দুঃসাহস আমার পক্ষে সহজ হইয়াছে—কারণ চাণক্য যাহাদিগকে কথা কহিতে বারণ করেন তাহারাই আগেভাগে কথা কহিয়া বসে,—আপনারাও জানেন angelরা প্রবেশ করিতে ভয় পান এমন জায়গা আছে কিন্তু foolদের কোথাও বাধা নাই। এরূপ সতর্কতায় সকল সময়েই যে এঞ্জেলরা জেতেন তাহা নহে অনেক সময়েই ঠকিয়া থাকেন; অবুঝ হঠকারিতায় অপর পক্ষের কখন কখন জিত হইবার সম্ভাবনা আছে এই আমার ভরসা। আপনার পক্ষে বোঝা সহজ হইতে পারে বলিয়াই আমি ইংরেজি দৃষ্টান্তগুলি ব্যবহার করিয়াছি ইহাতে আমার বিদ্যা প্রকাশ না হইয়া বিদ্যা ফাঁস হইয়া যাইতে পারে। যাহা হউক আমার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিলাম।

চিঠির মধ্যে কাটাকুটি অনেক রহিয়াছে সেই সমস্ত ক্ষতচিহ্নসমেত এটা আপনার কাছে চালান করিয়া দিলাম—এই ত্রুটিকে বেয়াদবি বলিয়া গণ্য করিবেন না। চিন্তার সঙ্গে লড়াই করিতে হইয়াছে—তবু রণে ভঙ্গ না দিয়া বক্ষের উপর তলোয়ারের দাগ বহিয়া এই পত্র আপনার সভায় হাজির হইয়া আপনাকে সেলাম জানাইতেছে। ইতি

১৮ আষাঢ়, ১৩২১

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

স্ত্রীর পত্র

শ্রীচরণকমলেষু—

আজ পনেরো বছর আমাদের বিবাহ হয়েছে আজ পর্য্যন্ত তোমাকে চিঠি লিখিনি। চিরদিন কাছেই পড়ে আছি—মুখের কথা অনেক শুনেছ, আমিও শুনেছি; চিঠি লেখবার মত ফাঁকটুকু পাওয়া যায়নি।

আজ আমি এসেছি তীর্থ করতে শ্রীক্ষেত্রে, তুমি আছ তোমার আপিসের কাজে। শামুকের সঙ্গে খোলসের যে সম্বন্ধ, কলকাতার সঙ্গে তোমার তাই; সে তোমার দেহমনের সঙ্গে এঁটে গিয়েছে। তাই তুমি আপিসে ছুটির দরখাস্ত করলে না। বিধাতার তাই অভিপ্রায় ছিল; তিনি আমার ছুটির দরখাস্ত মঞ্জুর করেছেন।

আমি তোমাদের মেজ বৌ। আজ পনেরো বছরের পরে এই সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে জান্‌তে পেরেছি আমার জগৎ এবং জগদীশ্বরের সঙ্গে আমার অন্য সম্বন্ধও আছে। তাই আজ সাহস করে এই চিঠিখানি লিখ্‌চি, এ তোমাদের মেজ-বৌয়ের চিঠি নয়।

তোমাদের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কপালে যিনি লিখেছিলেন তিনি ছাড়া যখন সেই সম্ভাবনার কথা আর কেউ জান্‌তনা সেই শিশু-বয়সে আমি আর আমার ভাই একসঙ্গেই সান্নিপাতিক জ্বরে পড়ি। আমার ভাইটি মারা গেল, আমি বেঁচে উঠ্‌লুম। পাড়ার সব মেয়েরাই বল্‌তে লাগ্‌ল, মৃণাল মেয়ে কিনা তাই ও বাঁচল, বেটাছেলে হলে কি আর রক্ষা পেত?—চুরিবিদ্যাতে যম পাকা; দামী জিনিষের পরেই তার লোভ।

আমার মরণ নেই। সেই কথাটাই ভালো করে বুঝিয়ে বলবার জন্যে এই চিঠিখানি লিখ্‌তে বসেছি।

যেদিন তোমাদের দূর-সম্পর্কের মামা তোমার বন্ধু নীরদকে নিয়ে কনে দেখ্‌তে এলেন তখন আমার বয়স বারো। দুর্গম পাড়াগাঁয়ে আমাদের বাড়ি, সেখানে দিনের-বেলা শেয়াল ডাকে। ষ্টেশন থেকে সাত ক্রোশ শ্যাকড়া গাড়িতে এসে বাকি তিন মাইল কাঁচা রাস্তায় পাল্কী করে তবে আমাদের গাঁয়ে পৌঁছন যায়। সেদিন তোমাদের কি হয়রানী! তার উপরে আমাদের বাঙাল-দেশের রান্না,—সেই রান্নার প্রহসন আজও মামা ভোলেননি।

তোমাদের বড়-বৌয়ের রূপের অভাব মেজ-বৌকে দিয়ে পূরণ করবার জন্যে তোমার মায়ের একান্ত জিদ ছিল। নইলে এত কষ্ট করে আমাদের সে গাঁয়ে তোমরা যাবে কেন? বাংলা দেশে পিলে যকৃৎ অম্লশূল এবং কনের জন্যে ত কাউকে খোঁজ করতে হয় না—তারা আপনি এসে চেপে ধরে, কিছুতে ছাড়তে চায় না।

বাবার বুক দুরদুর করতে লাগ্‌ল, মা দুর্গানাম জপ করতে লাগ্‌লেন। সহরের দেবতাকে পাড়াগাঁয়ের পূজারী কি দিয়ে সন্তুষ্ট করবে? মেয়ের রূপের উপর ভরসা; কিন্তু সেই রূপের গুমর ত মেয়ের মধ্যে নেই—যে ব্যক্তি দেখতে এসেছে সে তাকে যে দামই দেবে সেই তার দাম। তাই ত হাজার রূপে গুণেও মেয়েমানুষের সঙ্কোচ কিছুতে ঘোচে না।

সমস্ত বাড়ির, এমন কি, সমস্ত পাড়ার এই আতঙ্ক আমার বুকের মধ্যে পাথরের মত চেপে বস্‌ল। সেদিনকার আকাশের যত আলো এবং জগতের সকল শক্তি যেন বারো বছরের একটি পাড়াগেঁয়ে

মেয়েকে দুইজন পরীক্ষকের দুই-জোড়া চোখের সামনে শক্ত করে তুলে ধরবার জন্যে পেয়াদাগিরি করছিল—আমার কোথাও লুকোবার জায়গা ছিল না।

সমস্ত আকাশকে কাঁদিয়ে দিয়ে বাঁশি বাজ্‌তে লাগল—তোমাদের বাড়িতে এসে উঠ্‌লুম। আমার খুঁৎগুলি সবিস্তারে খতিয়ে দেখেও গিন্নির দল সকলে স্বীকার করলেন মোটের উপর আমি সুন্দরী বটে। সে কথা শুনে আমার বড় জায়ের মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। কিন্তু আমার রূপের দরকার কি ছিল তাই ভাবি! রূপ জিনিষটাকে যদি কোনো সেকেলে পণ্ডিত গঙ্গামৃত্তিকা দিয়ে গড়তেন তাহলে ওর আদর থাকৃত—কিন্তু ওটা যে কেবল বিধাতা নিজের আনন্দে গড়েছেন তাই তোমাদের ধর্ম্মের সংসারে ওর দাম নেই।

আমার যে রূপ আছে সে কথা ভুলতে তোমার বেশিদিন লাগেনি—কিন্তু আমার যে বুদ্ধি আছে সেটা তোমাদের পদে পদে স্মরণ করতে হয়েছে। ঐ বুদ্ধিটা আমার এতই স্বাভাবিক যে তোমাদের ঘরকন্নার মধ্যে এতকাল কাটিয়েও আজও সে টিঁকে আছে। মা আমার এই বুদ্ধিটার জন্যে বিষম উদ্বিগ্ন ছিলেন, মেয়েমানুষের পক্ষে এ এক বালাই। যাকে বাধা মেনে চল্‌তে হবে সে যদি বুদ্ধিকে মেনে চল্‌তে চায় তবে ঠোকর খেয়ে খেয়ে তার কপাল ভাঙবেই। কিন্তু কি করব বল? তোমাদের ঘরের বৌয়ের যতটা বুদ্ধির দরকার বিধাতা অসতর্ক হয়ে আমাকে তার চেয়ে অনেকটা বেশি দিয়ে ফেলেছেন, সে আমি এখন ফিরিয়ে দিই কাকে? তোমরা আমাকে মেয়ে-জ্যাঠা বলে দুবেলা গাল দিয়েছ। কটু কথাই হচ্চে অক্ষমের সান্ত্বনা—অতএব সে আমি ক্ষমা করলুম।

আমার একটা জিনিষ তোমাদের ঘরকন্নার বাইরে ছিল সেটা কেউ তোমরা জাননি। আমি লুকিয়ে কবিতা লিখ্‌তুম। সে ছাই পাঁশ যাই হোক্ না সেখানে তোমাদের অন্দরমহলের পাঁচিল ওঠেনি। সেইখানে আমার মুক্তি—সেইখানে আমি আমি। আমার মধ্যে যা কিছু তোমাদের মেজ-বৌকে ছাড়িয়ে রয়েছে সে তোমরা পছন্দ করনি চিন্‌তেও পারনি ;—আমি যে কবি সে এই পনেরো বছরেও তোমাদের কাছে ধরা পড়েনি।

তোমাদের ঘরের প্রথম স্মৃতির মধ্যে সব চেয়ে যেটা আমার মনে জাগচে সে তোমাদের গোয়াল-ঘর। অন্দরমহলের সিঁড়িতে ওঠবার ঠিক পাশের ঘরেই তোমাদের গোরু থাকে, সাম্‌নের উঠোনটুকু ছাড়া তাদের আর নড়বার জায়গা নেই। সেই উঠোনের কোণে তাদের জাবনা দেবার কাঠের গামলা। সকালে বেহারার নানা কাজ—উপবাসী গোরুগুলো ততক্ষণ সেই গামলার ধারগুলো চেটে চেটে চিবিয়ে চিবিয়ে খাব্‌লা করে দিত। আমার প্রাণ কাঁদত। আমি পাড়াগাঁয়ের মেয়ে—তোমাদের বাড়িতে যেদিন নতুন এলুম সেদিন সেই দুটি গোরু এবং তিনটি বাছুরই সমস্ত সহরের মধ্যে আমার চিরপরিচিত আত্মীয়ের মত আমার চোখে ঠেকল। যতদিন নতুন বৌ ছিলুম নিজে না খেয়ে লুকিয়ে ওদের খাওয়াতুম—যখন বড় হলুম তখন গোরুর প্রতি আমার প্রকাশ্য মমতা লক্ষ্য করে আমার ঠাট্টার সম্পর্কীয়েরা আমার গোত্রসম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করতে লাগ্‌লেন।

আমার মেয়েটি জন্ম নিয়েই মারা গেল। আমাকেও সে সঙ্গে যাবার সময় ডাক দিয়েছিল। সে যদি বেঁচে থাক্‌ত তাহলে সেই

আমার জীবনে, যা কিছু বড়, যা কিছু সত্য, সমস্ত এনে দিত; তখন মেজ-বৌ থেকে একেবারে মা হয়ে বস্‌তুম। মা যে এক-সংসারের মধ্যে থেকেও বিশ্বসংসারের। মা-হবার দুঃখটুকু পেলুম কিন্তু মা-হবার মুক্তিটুকু পেলুম না।

মনে আছে ইংরেজ ডাক্তার এসে আমাদের অন্দর দেখে আশ্চর্য্য হয়েছিল এবং আঁতুড়ঘর দেখে বিরক্ত হয়ে বকাবকি করেছিল। সদরে তোমাদের একটুখানি বাগান আছে। ঘরে সাজসজ্জা আসবাবের অভাব নেই। আর অন্দরটা যেন পশমের কাজের উল্টো পিঠ—সেদিকে কোনো লজ্জা নেই, শ্রী নেই, সজ্জা নেই। সেদিকে আলো মিট্‌মিট্ করে জ্বলে; হাওয়া চোরের মত প্রবেশ করে, উঠোনের আবর্জ্জনা নড়তে চায় না; দেয়ালের এবং মেজের সমস্ত কলঙ্ক অক্ষয় হয়ে বিরাজ করে। কিন্তু ডাক্তার একটা ভুল করেছিল, সে ভেবেছিল এটা বুঝি আমাদের অহোরাত্র দুঃখ দেয়। ঠিক উল্টো; অনাদর জিনিষটা ছাইয়ের মত: সে ছাই আগুনকে হয়ত ভিতরে ভিতরে জমিয়ে রাখে কিন্তু বাইরে থেকে তার তাপটাকে বুঝতে দেয় না। আত্মসম্মান যখন কমে যায় তখন অনাদরকে ত অন্যায্য বলে মনে হয় না। সেই জন্যে তার বেদনা নেই। তাই ত মেয়েমানুষ দুঃখ বোধ করতেই লজ্জা পায়। আমি তাই বলি মেয়েমানুষকে দুঃখ পেতেই হবে এইটে যদি তোমাদের ব্যবস্থা হয়—তাহলে যতদূর সম্ভব তাকে অনাদরে রেখে দেওয়াই ভালো। আদরে দুঃখের ব্যথাটা কেবল বেড়ে ওঠে।

যেমন করেই রাখ দুঃখ যে আছে এ কথা মনে করবার কথাও

কোনোদিন মনে আসেনি। আঁতুড়ঘরে মরণ মাথার কাছে এসে দাঁড়াল, মনে ভয়ই হল না। জীবন আমাদের কিইবা, যে মরণকে ভয় করতে হবে? আদরে যত্নে যাদের প্রাণের বাঁধন শক্ত করেছে, মরতে তাদেরই বাধে। সেদিন যম যদি আমাকে ধরে টান দিত তাহলে আলগা মাটি থেকে যেমন অতি সহজে ঘাসের চাপ্‌ড়া উঠে আসে সমস্ত শিকড়সুদ্ধ আমি তেমনি করে উঠে আস্‌তুম। বাঙালীর মেয়ে ত কথায় কথায় মরতে যায়। কিন্তু এমন মরায় বাহাদুরিটা কি! মরতে লজ্জা হয়,—আমাদের পক্ষে ওটা এতই সহজ।

আমার মেয়েটি ত সন্ধ্যাতারার মত ক্ষণকালের জন্যে উদয় হয়েই অস্ত গেল। আবার আমার নিত্যকর্ম্ম এবং গোরুবাছুর নিয়ে পড়লুম। জীবন তেমনি করেই গড়াতে গড়াতে শেষ পর্য্যন্ত কেটে যেত আজকে তোমাকে এই চিঠি লেখবার দরকারই হত না। কিন্তু বাতাসে সামান্য একটা বীজ উড়িয়ে নিয়ে এসে পাকা দালানের মধ্যে অশথগাছের অঙ্কুর বের করে; শেষকালে সেইটুকু থেকে ইঁটকাঠের বুকের পাঁজর বিদীর্ণ হয়ে যায়। আমার সংসারের পাকা বন্দোবস্তের মাঝখানে ছোট একটুখানি জীবনের কণা কোথা থেকে উড়ে এসে পড়ল, তার পর থেকে ফাটল সুরু হল।

বিধবা মার মৃত্যুর পরে আমার বড় জায়ের বোন বিন্দু তার খুড়তত ভাইদের অত্যাচারে আমাদের বাড়িতে তার দিদির কাছে এসে যেদিন আশ্রয় নিলে তোমরা সেদিন ভাবলে এ আবার কোথাকার আপদ! আমার পোড়া স্বভাব, কি করব বল, দেখ্‌লুম তোমরা সকলেই মনে মনে বিরক্ত হয়ে উঠেছ সেইজন্যেই এই

নিরাশ্রয় মেয়েটির পাশে আমার সমস্ত মন যেন একেবারে কোমর বেঁধে দাঁড়াল। পরের বাড়িতে পরের অনিচ্ছাতে এসে আশ্রয় নেওয়া—সে কত বড় অপমান! দায়ে পড়ে সেও যাকে স্বীকার করতে হল তাকে কি একপাশে ঠেলে রাখা যায়?

তার পরে দেখলুম আমার বড় জায়ের দশা। তিনি নিতান্ত দরদে পড়ে বোনটিকে নিজের কাছে এনেছেন। কিন্তু যখন দেখ্‌লেন স্বামীর অনিচ্ছা, তখন এমনি ভাব করতে লাগ্‌লেন যেন এ তাঁর এক বিষম বালাই—যেন এ'কে দূর করতে পারলেই তিনি বাঁচেন। এই অনাথা বোনটিকে মন খুলে প্রকাশ্যে স্নেহ দেখাবেন সে সাহস তাঁর হল না। তিনি পতিব্রতা।

তাঁর এই সঙ্কট দেখে আমার মন আরো ব্যথিত হয়ে উঠ্‌ল। দেখলুম বড় জা সকলকে একটু বিশেষ করে দেখিয়ে দেখিয়ে বিন্দুর খাওয়া-পরার এম্‌নি মোটা রকমের ব্যবস্থা করলেন, এবং বাড়ির সর্ব্বপ্রকার দাসীবৃত্তিতে তাকে এমন ভাবে নিযুক্ত করলেন যে আমার, কেবল দুঃখ নয়, লজ্জা বোধ হল। তিনি সকলের কাছে প্রমাণ করবার জন্যে ব্যস্ত যে আমাদের সংসারে ফাঁকি দিয়ে বিন্দুকে ভারি সুবিধাদরে পাওয়া গেছে। ও কাজ দেয় বিস্তর অথচ খরচের হিসাবে বেজায় শস্তা।

আমাদের বড় জায়ের বাপের বংশে কুল ছাড়া আর বড় কিছু ছিল না। রূপও না টাকাও না। আমার শ্বশুরের হাতে পায়ে ধরে কেমন করে তোমাদের ঘরে তাঁর বিবাহ হল সে ত সমস্তই জান। তিনি নিজের বিবাহটাকে এ বংশের প্রতি বিষম একটা অপরাধ বলেই চিরকাল মনে জেনেছেন। সেইজন্যে সকল বিষয়েই নিজেকে

যতদূর সম্ভব সঙ্কুচিত করে তোমাদের ঘরে তিনি অতি অল্প জায়গা জুড়ে থাকেন।

কিন্তু তাঁর এই সাধু দৃষ্টান্তে আমাদের বড় মুস্কিল হয়েছে। আমি সকল দিকে আপনাকে অত অসম্ভব খাটো করতে পারিনে। আমি যেটাকে ভালো বলে বুঝি আর-কারো খাতিরে সেটাকে মন্দ বলে মেনে নেওয়া আমার কর্ম্ম নয়—তুমিও তার অনেক প্রমাণ পেয়েছ।

বিন্দুকে আমি আমার ঘরে টেনে নিলুম। দিদি বল্লেন, "মেজ-বৌ গরীবের ঘরের মেয়ের মাথাটি খেতে বস্‌লেন।" আমি যেন বিষম একটা বিপদ ঘটালুম এমনি ভাবে তিনি সকলের কাছে নালিশ করে বেড়ালেন। কিন্তু আমি নিশ্চয় জানি তিনি মনে মনে বেঁচে গেলেন। এখন দোষের বোঝা আমার উপরেই পড়ল। তিনি বোনকে নিজে যে স্নেহ দেখাতে পারতেন না আমাকে দিয়ে সেই স্নেহটুকু করিয়ে নিয়ে তাঁর মনটা হাল্‌কা হল। আমার বড় জা বিন্দুর বয়স থেকে দুচারটে অঙ্ক বাদ দিতে চেষ্টা করতেন। কিন্তু তার বয়স যে চোদ্দর চেয়ে কম ছিল না একথা লুকিয়ে বল্‌লে অন্যায় হত না। তুমি ত জান সে দেখ্‌তে এতই মন্দ ছিল যে, পড়ে গিয়ে সে যদি মাথা ভাঙত তবে ঘরের মেজেটার জন্যেই লোকে উদ্বিগ্ন হত। কাজেই পিতামাতার অভাবে কেউ তাকে বিয়ে দেবার ছিল না, এবং তাকে বিয়ে করবার মত মনের জোরই বা ক'জন লোকের ছিল।

বিন্দু বড় ভয়ে ভয়ে আমার কাছে এল। যেন আমার গায়ে তার ছোঁয়াচ লাগ্‌লে আমি সইতে পারব না। বিশ্বসংসারে তার

যেন জন্মাবার কোনো সর্ত্ত ছিল না—তাই সে কেবলি পাশ কাটিয়ে চোখ এড়িয়ে চল্‌ত। তার বাপের বাড়িতে তার খুড়তত ভাইরা তাকে এমন একটু কোণও ছেড়ে দিতে চায়নি যে কোণে একটা অনাবশ্যক জিনিষ পড়ে থাকতে পারে। অনাবশ্যক আবর্জ্জনা ঘরের আশেপাশে অনায়াসে স্থান পায় কেননা মানুষ তাকে ভুলে যায়, কিন্তু অনাবশ্যক মেয়েমানুষ যে একে অনাবশ্যক আবার তার উপরে তাকে ভোলাও শক্ত সেইজন্যে আঁস্তাকুঁড়েও তার স্থান নেই। অথচ বিন্দুর খুড়তত ভাইরা যে জগতে পরমাবশ্যক পদার্থ তা বলবার জো নেই। কিন্তু তারা বেশ আছে।

তাই বিন্দুকে যখন আমার ঘরে ডেকে আন্‌লুম তার বুকের মধ্যে কাঁপতে লাগ্‌ল। তার ভয় দেখে আমার বড় দুঃখ হল। আমার ঘরে যে তার একটুখানি জায়গা আছে সেই কথাটি আমি অনেক আদর করে তাকে বুঝিয়ে দিলুম।

কিন্তু আমার ঘর শুধু ত আমারই ঘর নয়। কাজেই আমার কাজটি সহজ হল না। দুচার দিন আমার কাছে থাক্‌তেই তার গায়ে লাল-লাল কি উঠ্‌ল—হয় ত সে ঘামাচি, নয় ত আর কিছু হবে। তোমরা বল্‌লে বসন্ত। কেননা, ওযে বিন্দু। তোমাদের পাড়ার এক আনাড়ি ডাক্তার এসে বল্‌লে, আর দুই একদিন না গেলে ঠিক বলা যায় না। কিন্তু সেই দুই একদিনের সবুর সইবে কে? বিন্দু ত তার ব্যামোর লজ্জাতেই মরবার জো হল। আমি বল্‌লুম, বসন্ত হয় ত হোক্—আমি আমাদের সেই আঁতুড়ঘরে ওকে নিয়ে থাক্‌ব, আর কাউকে কিছু করতে হবে না। এই নিয়ে আমার উপরে তোমরা যখন সকলে মারমূর্ত্তি ধরেছ, এমন কি বিন্দুর দিদিও যখন

অত্যন্ত বিরক্তির ভান করে পোড়াকপালি মেয়েটাকে হাঁসপাতালে পাঠাবার প্রস্তাব করচেন এমন সময় ওর গায়ের সমস্ত লাল দাগ একদম মিলিয়ে গেল। তোমরা দেখি তাতে আরো ব্যস্ত হয়ে উঠ্‌লে। বল্‌লে, নিশ্চয়ই বসন্ত বসে গিয়েছে। কেননা, ওযে বিন্দু।

অনাদরে মানুষ হবার একটা মস্ত গুণ, শরীরটাকে তাতে একেবারে অজর অমর করে তোলে। ব্যামো হতেই চায় না—মরার সদর রাস্তাগুলো একেবারেই বন্ধ। রোগ তাই ওকে ঠাট্টা করে গেল, কিছুই হল না। কিন্তু এটা বেশ বোঝা গেল পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে অকিঞ্চিৎকর মানুষকে আশ্রয় দেওয়াই সব চেয়ে কঠিন! আশ্রয়ের দরকার তার যত বেশি আশ্রয়ের বাধাও তার তেমনি বিষম।

আমার সম্বন্ধে বিন্দুর ভয় যখন ভাঙল তখন ওকে আর-এক গেরোয় ধরল। আমাকে এমনি ভালবাস্‌তে সুরু কর্‌লে যে আমাকে ভয় ধরিয়ে দিলে। ভালবাসার এ রকম মূর্ত্তি সংসারে ত কোনোদিন দেখিনি। বইয়েতে পড়েছি বটে, সেও মেয়ে পুরুষের মধ্যে। আমার যে রূপ ছিল সে কথা আমার মনে করবার কোনো কারণ বহুকাল ঘটেনি—এতদিন পরে সেই রূপটা নিয়ে পড়ল এই কুশ্রী মেয়েটি। আমার মুখ দেখে তার চোখের আশ আর মিটত না। বল্‌ত, "দিদি তোমার এই মুখখানি আমি-ছাড়া আর কেউ দেখ্‌তে পায়নি।" যেদিন আমি নিজের চুল নিজে বাঁধতুম সেদিন তার ভারি অভিমান। আমার চুলের বোঝা দুই হাত দিয়ে নাড়তে চাড়তে তার ভারি ভালো লাগ্‌ত। কোথাও নিমন্ত্রণে যাওয়া ছাড়া আমার সাজগোজের ত দরকার ছিল না—কিন্তু বিন্দু আমাকে অস্থির করে

রোজই কিছু-না-কিছু সাজ করাত। মেয়েটা আমাকে নিয়ে একেবারে পাগল হয়ে উঠ্‌ল।

তোমাদের অন্দরমহলে কোথাও জমি এক ছটাক নেই। উত্তর দিকের পাঁচিলের গায়ে নর্দ্দমার ধারে কোনোগতিকে একটা গাব গাছ জন্মেছে। যেদিন দেখ্‌তুম সেই গাবের গাছের নতুন পাতাগুলি রাঙা টক্‌টকে হয়ে উঠেছে সেইদিন জান্‌তুম ধরাতলে বসন্ত এসেছে বটে। আমার ঘরকন্নার মধ্যে ঐ অনাদৃত মেয়েটার চিত্ত যেদিন আগাগোড়া এমন রঙীন হয়ে উঠ্‌ল সেদিন আমি বুঝলুম হৃদয়ের জগতেও একটা বসন্তের হাওয়া আছে—সে কোন্ স্বর্গ থেকে আসে, গলির মোড় থেকে আসে না।

বিন্দুর ভালবাসার দুঃসহবেগে আমাকে অস্থির করে তুলেছিল—একএকবার তার উপর রাগ হত সে কথা স্বীকার করি—কিন্তু তার এই ভালবাসার ভিতর দিয়ে আমি আপনার একটি স্বরূপ দেখলুম যা আমি জীবনে আর কোনোদিন দেখিনি। সেই আমার মুক্ত স্বরূপ।

এদিকে, বিন্দুর মত মেয়েকে আমি যে এতটা আদর যত্ন করচি এ তোমাদের অত্যন্ত বাড়াবাড়ি বলে ঠেকল। এর জন্যে খুঁৎ-খুঁৎ খিটখিটের অন্ত ছিল না। যেদিন আমার ঘর থেকে বাজুবন্ধ চুরি গেল সেদিন সেই চুরিতে বিন্দুর যে কোনোরকমের হাত ছিল এ কথার আভাস দিতে তোমাদের লজ্জা হল না। যখন স্বদেশী হাঙ্গামায় লোকের বাড়িতল্লাসী হতে লাগ্‌ল তখন তোমরা অনায়াসে সন্দেহ করে বস্‌লে যে, বিন্দু পুলিষের পোষা মেয়ে-চর। তার আর কোনো প্রমাণ ছিল না কেবল এই প্রমাণ যে, ও বিন্দু।

তোমাদের বাড়ির দাসীরা ওর কোনোরকম কাজ করতে আপত্তি

করত,—তাদের কাউকে ওর কাজ করবার ফরমাস করলে ও মেয়েও একেবারে সঙ্কোচে যেন আড়ষ্ট হয়ে উঠ্‌ত। এই সকল কারণেই ওর জন্যে আমার খরচ বেড়ে গেল। আমি বিশেষ করে একজন আলাদা দাসী রাখ্‌লুম। সেটা তোমাদের ভালো লাগেনি। বিন্দুকে আমি যে সব কাপড় পরতে দিতুম তা দেখে তুমি এত রাগ করেছিলে যে আমার হাত-খরচের টাকা বন্ধ করে দিলে। তার পরদিন থেকে আমি পাঁচশিকে দামের জোড়া মোটা কোরা কলের ধুতি পরতে আরম্ভ করে দিলুম। আর মতির মা যখন আমার এঁটো ভাতের থালা নিয়ে যেতে এল তাকে বারণ করে দিলুম। আমি নিজে উঠোনের কলতলায় গিয়ে এঁটো ভাত বাছুরকে খাইয়ে বাসন মেজেছি। একদিন হঠাৎ সেই দৃশ্যটি দেখে তুমি খুব খুসি হওনি। আমাকে খুসি না করলেও চলে আর তোমাদের খুসি না করলেই নয় এই সুবুদ্ধিটা আজ পর্য্যন্ত আমার ঘটে এল না।

এদিকে তোমাদের রাগও যেমন বেড়ে উঠেছে বিন্দুর বয়সও তেমনি বেড়ে চলেছে। সেই স্বাভাবিক ব্যাপারে তোমরা অস্বাভাবিক রকমে বিব্রত হয়ে উঠেছিলে। একটা কথা মনে করে আমি আশ্চর্য্য হই তোমরা জোর করে কেন বিন্দুকে তোমাদের বাড়ি থেকে বিদায় করে দাওনি। আমি বেশ বুঝি তোমরা আমাকে মনে মনে ভয় কর। বিধাতা যে আমাকে বুদ্ধি দিয়েছিলেন ভিতরে ভিতরে তার খাতির না করে তোমরা বাঁচ না।

অবশেষে বিন্দুকে নিজের শক্তিতে বিদায় কর্‌তে না পেরে তোমরা প্রজাপতি-দেবতার শরণাপন্ন হলে। বিন্দুর বর ঠিক হল। বড় জা বল্‌লেন, বাঁচ্‌লুম, মা কালী আমাদের বংশের মুখ রক্ষা কর্‌লেন।

বর কেমন তা জানিনে ; তোমাদের কাছে শুন্‌লুম সকল বিষয়েই ভালো। বিন্দু আমার পা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগ্‌ল—বল্লে, "দিদি, আমার আবার বিয়ে করা কেন ?"

আমি তাকে অনেক বুঝিয়ে বল্‌লুম,—"বিন্দু, তুই ভয় করিস্‌নে—শুনেছি তোর বর ভালো।"

বিন্দু বল্‌লে,—"বর যদি ভালো হয় আমার কি আছে যে আমাকে তার পছন্দ হবে ?"

বরপক্ষেরা বিন্দুকে ত দেখ্‌তে আসবার নামও কর্‌লে না। বড় দিদি তাতে বড় নিশ্চিন্ত হলেন।

কিন্তু দিনরাত্রে বিন্দুর কান্না আর থাম্‌তে চায় না। সে তার কি কষ্ট সে আমি জানি। বিন্দুর জন্যে আমি সংসারে অনেক লড়াই করেছি কিন্তু ওর বিবাহ বন্ধ হোক্ এ কথা বলবার সাহস আমার হল না। কিসের জোরেই বা বল্‌ব ? আমি যদি মারা যাই ত ওর কি দশা হবে ?

একে ত মেয়ে, তাতে কালো মেয়ে—কার ঘরে চল্‌ল, ওর কি দশা হবে—সে কথা না ভাবাই ভালো। ভাবতে গেলে প্রাণ কেঁপে ওঠে।

বিন্দু বল্লে,—"দিদি, বিয়ের আর পাঁচদিন আছে, এর মধ্যে আমার মরণ হবে না কি ?"

আমি তাকে খুব ধম্‌কে দিলুম কিন্তু অন্তর্যামী জানেন যদি কোনো সহজভাবে বিন্দুর মৃত্যু হতে পারত তাহলে আমি আরাম বোধ করতুম।

বিবাহের আগের দিন বিন্দু তার দিদিকে গিয়ে বল্লে,—"দিদি,

আমি তোমাদের গোয়ালঘরে পড়ে থাকব, আমাকে যা বল্‌বে তাই করব, তোমার পায়ে পড়ি আমাকে এমন করে ফেলে দিয়ো না।”

কিছুকাল থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে দিদির চোখ দিয়ে জল পড়ছিল, সেদিনও পড়ল। কিন্তু শুধু হৃদয় ত নয় শাস্ত্রও আছে ; তিনি বল্লেন, —“জানিস্ ত, বিন্দী, পতিই হচ্চে স্ত্রীলোকের গতিমুক্তি সব। কপালে যদি দুঃখ থাকে ত কেউ খণ্ডাতে পারবে না।”

আসল কথা হচ্চে কোনো দিকে কোনো রাস্তাই নেই—বিন্দুকে বিবাহ করতেই হবে—তার পরে যা হয় তা হোক্।

আমি চেয়েছিলুম বিবাহটা যাতে আমাদের বাড়িতেই হয়। কিন্তু তোমরা বলে বস্‌লে বরের বাড়িতেই হওয়া চাই—সেটা তাদের কৌলিক প্রথা।

আমি বুঝলুম বিন্দুর বিবাহের জন্যে যদি তোমাদের খরচ করতে হয় তবে সেটা তোমাদের গৃহদেবতার কিছুতেই সইবে না। কাজেই চুপ করে যেতে হল। কিন্তু একটি কথা তোমরা কেউ জানো না। দিদিকে জানাবার ইচ্ছে ছিল কিন্তু জানাইনি কেননা তাহলে তিনি ভয়েই মরে যেতেন,—আমার কিছু কিছু গয়না দিয়ে আমি লুকিয়ে বিন্দুকে সাজিয়ে দিয়েছিলুম। বোধ করি দিদির চোখে সেটা পড়ে থাক্‌বে কিন্তু সেটা তিনি দেখেও দেখেননি। দোহাই ধর্ম্মের, সেজন্যে তোমরা তাঁকে ক্ষমা কোরো।

যাবার আগে বিন্দু আমাকে জড়িয়ে ধরে বল্লে,—“দিদি, আমাকে তোমরা তাহলে নিতান্তই ত্যাগ করলে ?”

আমি বল্লুম,—“না বিন্দী, তোর যেমন দশাই হোকনা কেন আমি তোকে শেষ পর্য্যন্ত ত্যাগ করব না।”

তিন দিন গেল। তোমাদের তালুকের প্রজা খাবার জন্যে তোমাকে যে ভেড়া দিয়েছিল তাকে তোমার জঠরাগ্নি থেকে বাঁচিয়ে আমি আমাদের একতলায় কয়লা-রাখবার ঘরের একপাশে বাস করতে দিয়েছিলুম। সকালে উঠেই আমি নিজে তাকে দানা খাইয়ে আস্‌তুম; —তোমার চাকরদের প্রতি দুই একদিন নির্ভর করে দেখেছি তাকে খাওয়ানোর চেয়ে তাকে খাওয়ার প্রতিই তাদের বেশি ঝোঁক।

সেদিন সকালে সেই ঘরে ঢুকে দেখি বিন্দু এককোণে জড়সড় হয়ে বসে আছে। আমাকে দেখেই আমার পা জড়িয়ে ধরে লুটিয়ে পড়ে নিঃশব্দে কাঁদতে লাগ্‌ল।

বিন্দুর স্বামী পাগল।

"সত্যি বলছিস্ বিন্দী ?"

"এত বড় মিথ্যা কথা তোমার কাছে বল্‌তে পারি দিদি ? তিনি পাগল। শ্বশুরের এই বিবাহে মত ছিল না—কিন্তু তিনি আমার শাশুড়িকে যমের মত ভয় করেন। তিনি বিবাহের পূর্ব্বেই কাশী চলে গেছেন। শাশুড়ি জেদ করে তাঁর ছেলের বিয়ে দিয়েছেন।"

আমি সেই রাশ-করা কয়লার উপর বসে পড়লুম। মেয়েমানুষকে মেয়েমানুষ দয়া করে না। বলে, ও ত মেয়েমানুষ বই ত নয়। ছেলে হোক্‌না পাগল, সে ত পুরুষ বটে।

বিন্দুর স্বামীকে হঠাৎ পাগল বলে বোঝা যায় না—কিন্তু এক-একদিন সে এমন উন্মাদ হয়ে ওঠে যে তাকে ঘরে তালাবন্ধ করে রাখ্‌তে হয়। বিবাহের রাত্রে সে ভালো ছিল কিন্তু রাত-জাগা প্রভৃতি উৎপাতে দ্বিতীয় দিন থেকে তার মাথা একেবারে খারাপ

হয়ে উঠ্‌ল। বিন্দু দুপুরবেলা পিতলের থালায় ভাত খেতে বসেছিল হঠাৎ তার স্বামী থালাসুদ্ধ ভাত টেনে উঠোনে ফেলে দিলে। হঠাৎ কেমন তার মনে হয়েছে, বিন্দু স্বয়ং রাণীরাসমণি; বেহারাটা নিশ্চয় সোনার থালা চুরি করে রাণীকে তার নিজের থালায় ভাত খেতে দিয়েছে। এই তার রাগ। বিন্দু ত ভয়ে মরে গেল। তৃতীয় রাত্রে শাশুড়ি তাকে যখন স্বামীর ঘরে শুতে বল্‌লে বিন্দুর প্রাণ শুকিয়ে গেল। শাশুড়ি তার প্রচণ্ড, রাগলে জ্ঞান থাকে না। সেও পাগল, কিন্তু পূরো নয় বলেই আরো ভয়ানক। বিন্দুকে ঘরে ঢুক্‌তে হল। স্বামী সে রাত্রে ঠাণ্ডা ছিল। কিন্তু ভয়ে বিন্দুর শরীর যেন কাঠ হয়ে গেল। স্বামী যখন ঘুমিয়েছে অনেক রাত্রে সে অনেক কৌশলে পালিয়ে চলে এসেছে তার বিস্তারিত বিবরণ লেখবার দরকার নেই।

ঘৃণায় রাগে আমার সকল শরীর জ্বলতে লাগল। আমি বল্লুম, এমন ফাঁকির বিয়ে বিয়েই নয়। বিন্দু তুই যেমন ছিলি তেমনি আমার কাছে থাক, দেখি তোকে কে নিয়ে যেতে পারে।

তোমরা বল্লে, বিন্দু মিথ্যা কথা বল্‌চে।

আমি বল্লুম, ও কখনো মিথ্যা বলেনি।

তোমরা বল্লে, কেমন করে জান্‌লে?

আমি বল্লুম, আমি নিশ্চয় জানি।

তোমরা ভয় দেখালে বিন্দুর শ্বশুরবাড়ির লোকে পুলিস্‌-কেস্‌ কর্‌লে মুস্কিলে পড়তে হবে।

আমি বল্লুম, ফাঁকি দিয়ে পাগল বরের সঙ্গে ওর বিয়ে দিয়েছে এ কথা কি আদালত শুন্‌বে না?

তোমরা বল্লে, তবে কি এই নিয়ে আদালত কর্ত্তে হবে নাকি ? কেন আমাদের দায় কিসের ?

আমি বল্লুম, আমি নিজের গয়না বেচে যা করতে পারি করব।

তোমরা বল্লে, উকীলবাড়ি ছুটবে না কি ?

এ কথার জবাব নেই। কপালে করাঘাত করতে পারি, তার বেশি আর কি করব ?

ওদিকে বিন্দুর শ্বশুরবাড়ি থেকে ওর ভাসুর এসে বাইরে বিষম গোল বাধিয়েছে। সে বল্‌চে সে থানায় খবর দেবে।

আমার যে কি জোর আছে জানিনে—কিন্তু কশাইয়ের হাত থেকে যে গোরু প্রাণভয়ে পালিয়ে এসে আমার আশ্রয় নিয়েছে তাকে পুলিসের তাড়ায় আবার সেই কশাইয়ের হাতে ফিরিয়ে দিতেই হবে একথা কোনোমতেই আমার মন মানতে পারল না। আমি স্পর্দ্ধা করে বল্লুম, তা দিক্ থানায় খবর !

এই বলে মনে করলুম, বিন্দুকে এইবেলা আমার শোবার ঘরে এনে তাকে নিয়ে ঘরে তালাবন্ধ করে বসে থাকি। খোঁজ করে দেখি, বিন্দু নেই। তোমাদের সঙ্গে আমার বাদ প্রতিবাদ যখন চলছিল তখন বিন্দু আপনি বাইরে, গিয়ে তার ভাসুরের কাছে ধরা দিয়েছে। বুঝেছে এ বাড়িতে যদি সে থাকে তবে আমাকে সে বিষম বিপদে ফেল্‌বে।

মাঝখানে পালিয়ে এসে বিন্দু আপন দুঃখ আরো বাড়ালে। তার শাশুড়ির তর্ক এই যে, তার ছেলে ত ওকে খেয়ে ফেল্‌ছিল না। মন্দ স্বামীর দৃষ্টান্ত সংসারে দুর্লভ নয় তাদের সঙ্গে তুলনা করলে তার ছেলে যে সোনার চাঁদ।

আমার বড় জা বল্লেন, ওর পোড়াকপাল, তা নিয়ে দুঃখ করে কি করব ? তা পাগল হোক্ ছাগল হোক্ স্বামী ত বটে।

কুষ্ঠ রোগীকে কোলে করে তার স্ত্রী বেশ্যার বাড়িতে নিজে পৌঁছে দিয়েছে সতী সাধ্বীর সেই দৃষ্টান্ত তোমাদের মনে জাগছিল ; জগতের মধ্যে অধমতম কাপুরুষতার এই গল্পটা প্রচার করে আস্‌তে তোমাদের পুরুষের মনে আজ পর্য্যন্ত একটুও সঙ্কোচ বোধ হয়নি, সেইজন্যই মানবজন্ম নিয়েও বিন্দুর ব্যবহারে তোমরা রাগ করতে পেরেছ, তোমাদের মাথা হেঁট হয়নি। বিন্দুর জন্যে আমার বুক ফেটে গেল কিন্তু তোমাদের জন্যে আমার লজ্জার সীমা ছিলনা। আমি ত পাড়াগেঁয়ে মেয়ে, তার উপরে তোমাদের ঘরে পড়েছি, ভগবান কোন্ ফাঁক দিয়ে আমার মধ্যে এমন বুদ্ধি দিলেন ? তোমাদের এই সব ধর্ম্মের কথা আমি যে কিছুতেই সইতে পারলুম না !

আমি নিশ্চয় জানতুম, মরে গেলেও বিন্দু আমাদের ঘরে আর আস্‌বে না। কিন্তু আমি যে তাকে বিয়ের আগের দিন আশা দিয়েছিলুম যে, তাকে শেষ পর্য্যন্ত ত্যাগ করব না। আমার ছোট ভাই শরৎ কলকাতায় কলেজে পড়ছিল ; তোমরা জানই ত যত-রকমের ভলণ্টিয়ারি করা, প্লেগের পাড়ার ইঁদুর মারা, দামোদরের বন্যায় ছোটা, এতেই তার এত উৎসাহ যে উপরি উপরি দুবার সে এফ,এ, পরীক্ষায় ফেল করেও কিছুমাত্র দমে যায়নি। তাকে আমি ডেকে বল্লুম, বিন্দুর খবর যাতে আমি পাই তোকে সেই বন্দোবস্ত করে দিতে হবে শরৎ। বিন্দু আমাকে চিঠি লিখতে সাহস করবে না—লিখ্‌লেও আমি পাব না।

এ রকম কাজের চেয়ে যদি তাকে বলতুম বিন্দুকে ডাকাতি

করে আন্‌তে কিম্বা তার পাগল স্বামীর মাথা ভেঙে দিতে তাহলে সে বেশি খুসি হত।

শরতের সঙ্গে আলোচনা করচি এমন সময় তুমি ঘরে এসে বল্লে আবার কি হাঙ্গামা বাধিয়েছ ?

আমি বল্লুম, সেই যা সব গোড়ায় বাধিয়েছিলুম, তোমাদের ঘরে এসেছিলুম,—কিন্তু সে ত তোমাদেরই কীর্ত্তি।

তুমি জিজ্ঞাসা করলে,—"বিন্দুকে আবার এনে কোথাও লুকিয়ে রেখেছ ?"

আমি বল্লুম,—"বিন্দু যদি আস্‌ত তাহলে নিশ্চয় এনে লুকিয়ে রাখতুম। কিন্তু সে আস্‌বে না, তোমাদের ভয় নেই।"

শরৎকে আমার কাছে দেখে তোমার সন্দেহ আরো বেড়ে উঠল। আমি জানতুম শরৎ আমাদের বাড়ি যাতায়াত করে এ তোমরা কিছুতেই পছন্দ করতে না। তোমাদের ভয় ছিল ওর পরে পুলিসের দৃষ্টি আছে—কোন্‌দিন ও কোন্ রাজনৈতিক মাম্‌লায় পড়বে তখন তোমাদের সুদ্ধ জড়িয়ে ফেলবে। সেইজন্যে আমি ওকে ভাইফোঁটা পর্য্যন্ত লোক দিয়ে পাঠিয়ে দিতুম, ঘরে ডাকতুম না।

তোমার কাছে শুন্‌লুম বিন্দু আবার পালিয়েছে তাই তোমাদের বাড়িতে তার ভাসুর খোঁজ করতে এসেছে। শুনে আমার বুকের মধ্যে শেল বিঁধল। হতভাগিনীর যে কি অসহ্য কষ্ট তা বুঝলুম অথচ কিছুই করবার রাস্তা নেই।

শরৎ খবর নিতে ছুটল। সন্ধ্যার সময় ফিরে এসে আমাকে বল্লে, বিন্দু তার খুড়তত ভাইদের বাড়ি গিয়েছিল কিন্তু তারা তুমুল রাগ করে তখনি আবার তাকে শ্বশুড়বাড়ি পৌঁছে দিয়ে গেছে।

এর জন্যে তাদের খেসারৎ এবং গাড়িভাড়া দণ্ড যা ঘটেছে তার ঝাঁজ এখনো তাদের মন থেকে মরেনি।

তোমাদের খুড়িমা শ্রীক্ষেত্রে তীর্থ করতে যাবেন বলে তোমাদের বাড়িতে এসে উঠেছেন। আমি তোমাদের বল্লুম, আমিও যাব।

আমার হঠাৎ এমন ধর্ম্মে মন হয়েছে দেখে তোমরা এত খুসি হয়ে উঠলে যে কিছুমাত্র আপত্তি করলে না। এ কথাও মনে ছিল যে, এখন যদি কলকাতায় থাকি তবে আবার কোন্‌দিন বিন্দুকে নিয়ে ফ্যাসাদ বাধিয়ে বস্‌ব। আমাকে নিয়ে বিষম ল্যাঠা।

বুধবারে আমাদের যাবার দিন, রবিবারে সমস্ত ঠিক হল। আমি শরৎকে ডেকে বল্লুম, যেমন করে হোক্ বিন্দুকে বুধবারে পুরী-যাবার গাড়ীতে তোকে তুলে দিতে হবে।

শরতের মুখ প্রফুল্ল হয়ে উঠল,—সে বল্লে, ভয় নেই দিদি, আমি তাকে গাড়িতে তুলে দিয়ে পুরী পর্য্যন্ত চলে যাব—ফাঁকি দিয়ে জগন্নাথ দেখা হয়ে যাবে।

সেইদিন সন্ধ্যার সময় শরৎ আবার এল। তার মুখ দেখেই আমার বুক দমে গেল। আমি বল্লুম,—"কি শরৎ, সুবিধা হল না বুঝি?"

সে বল্লে,—"না।"

আমি বল্‌লুম,—"রাজি করতে পারলিনে?"

সে বল্লে,—"আর দরকারও নেই। কাল রাত্তিরে সে কাপড়ে আগুন ধরিয়ে আত্মহত্যা করে মরেছে। বাড়ির যে ভাইপোটার সঙ্গে ভাব করে নিয়েছিলুম, তার কাছে খবর পেলুম তোমার নামে সে একটা চিঠি রেখে গিয়েছিল কিন্তু সে চিঠি ওরা নষ্ট করেছে।"

যাক্, শান্তি হল!

দেশসুদ্ধ লোক চটে উঠল। বল্‌তে লাগল, মেয়েদের কাপড়ে আগুন লাগিয়ে মরা একটা ফ্যাসান্ হয়েছে।

তোমরা বল্‌লে, এ সমস্ত নাটক করা! তা হবে। কিন্তু নাটকের তামাসাটা কেবল বাঙালী মেয়েদের শাড়ির উপর দিয়েই হয় কেন, আর বাঙালী বীরপুরুষদের কোঁচার উপর দিয়ে হয় না কেন সেটাও ত ভেবে দেখা উচিত।

বিন্দীটার এম্‌নি পোড়াকপাল বটে! যতদিন বেঁচে ছিল রূপে গুণে কোনো যশ পায়নি—মরবার বেলাও যে একটু ভেবে চিন্তে এমন একটা নতুন ধরনে মরবে যাতে দেশের পুরুষরা খুসি হয়ে হাততালি দেবে তাও তার ঘটে এল না! মরেও লোকদের চটিয়ে দিলে!

দিদি ঘরের মধ্যে লুকিয়ে কাঁদলেন। কিন্তু সে কান্নার মধ্যে একটা সান্ত্বনা ছিল। যাই হোক্ না কেন, তবু রক্ষা হয়েছে, মরেছে বইত না; বেঁচে থাকলে কি না হতে পারত!

আমি তীর্থে এসেছি। বিন্দুর আর আসবার দরকার হল না, কিন্তু আমার দরকার ছিল।

দুঃখ বল্‌তে লোকে যা বোঝে তোমাদের সংসারে তা আমার ছিল না। তোমাদের ঘরে খাওয়া-পরা অসচ্ছল নয়; তোমার দাদার চরিত্র যেমন হোক্ তোমার চরিত্রে এমন কোনো দোষ নেই যাতে বিধাতাকে মন্দ বল্‌তে পারি। যদি বা তোমার স্বভাব তোমার দাদার মতই হত তাহলেও হয়ত মোটের উপর আমার এমনি ভাবেই দিন চলে যেত এবং আমার সতীসাধ্বী বড় জায়ের মত পতিদেবতাকে দোষ না দিয়ে বিশ্বদেবতাকেই আমি দোষ দেবার

চেষ্টা করতুম। অতএব তোমাদের নামে আমি কোনো নালিশ উত্থাপন করতে চাইনে—আমার এ চিঠি সেজন্যে নয়।

কিন্তু আমি আর তোমাদের সেই সাতাশ নম্বর মাখন ময়রার গলিতে ফিরব না। আমি বিন্দুকে দেখেছি। সংসারের মাঝখানে মেয়েমানুষের পরিচয়টা যে কি তা আমি পেয়েছি। আর আমার দরকার নেই।

তারপরে এও দেখেছি ও মেয়ে বটে তবু ভগবান ওকে ত্যাগ করেন নি। ওর উপরে তোমাদের যত জোরই থাক না কেন, সে জোরের অন্ত আছে। ও আপনার হতভাগ্য মানবজন্মের চেয়ে বড়। তোমরাই যে আপন ইচ্ছামত আপন দস্তুর দিয়ে ওর জীবনটাকে চিরকাল পায়ের তলায় চেপে রেখে দেবে তোমাদের পা এত লম্বা নয়! মৃত্যু তোমাদের চেয়ে বড়। সেই মৃত্যুর মধ্যে সে মহান—সেখানে বিন্দু কেবল বাঙালী ঘরের মেয়ে নয়, কেবল খুড়তত ভাইয়ের বোন নয়, কেবল অপরিচিত পাগল স্বামীর প্রবঞ্চিত স্ত্রী নয়। সেখানে সে অনন্ত।

সেই মৃত্যুর বাঁশি এই বালিকার ভাঙা হৃদয়ের ভিতর দিয়ে আমার জীবনের যমুনাপারে যেদিন বাজল সেদিন প্রথমটা আমার বুকের মধ্যে যেন বাণ বিঁধল। বিধাতাকে জিজ্ঞাসা করলুম জগতের মধ্যে যা কিছু সব চেয়ে তুচ্ছ তাই সব চেয়ে কঠিন কেন? এই গলির মধ্যকার চারিদিকে-প্রাচীর-তোলা নিরানন্দের অতি সামান্য বুদ্বুদটা এমন ভয়ঙ্কর বাধা কেন? তোমার বিশ্বজগৎ তার ছয় ঋতুর সুধাপাত্র হাতে করে যেমন করেই ডাক দিক্ না —একমুহূর্ত্তের জন্যে কেন আমি এই অন্দরমহলটার এইটুকুমাত্র

চৌকাঠ পেরতে পারি নে ?—তোমার এমন ভুবনে আমার এমন জীবন নিয়ে কেন ঐ অতি তুচ্ছ ইঁটকাঠের আড়ালটার মধ্যেই আমাকে তিলে তিলে মরতেই হবে। কত তুচ্ছ আমার এই প্রতি-দিনের জীবনযাত্রা, কত তুচ্ছ এর সমস্ত বাঁধা নিয়ম, বাঁধা অভ্যাস, বাঁধা বুলি, এর সমস্ত বাঁধা মার—কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সেই দীনতার নাগপাশবন্ধনেরই হবে জিত,—আর হার হল তোমার নিজের সৃষ্টি ঐ আনন্দলোকের ?

কিন্তু মৃত্যুর বাঁশি বাজতে লাগল,—কোথায় রে রাজমিস্ত্রির গড়া দেয়াল, কোথায় রে তোমাদের ঘোরো আইন দিয়ে গড়া কাঁটার বেড়া ! কোন্ দুঃখে কোন্ অপমানে মানুষকে বন্দী করে রেখে দিতে পারে ! ঐ ত মৃত্যুর হাতে জীবনের জয়পতাকা উড়চে ! ওরে মেজ-বৌ, ভয় নেই তোর ! তোর মেজ-বৌয়ের খোলষ ছিন্ন হতে এক নিমেষও লাগে না !

তোমাদের গলিকে আর আমি ভয় করিনে। আমার সম্মুখে আজ নীল সমুদ্র, আমার মাথার উপরে আষাঢ়ের মেঘপুঞ্জ।

তোমাদের অভ্যাসের অন্ধকারে আমাকে ঢেকে রেখে দিয়েছিলে। ক্ষণকালের জন্য বিন্দু এসে সেই আবরণের ছিদ্র দিয়ে আমাকে দেখে নিয়েছিল। সেই মেয়েটাই তার আপনার মৃত্যু দিয়ে আমার আবরণখানা আগাগোড়া ছিন্ন করে দিয়ে গেল। আজ বাইরে এসে দেখি আমার গৌরব রাখবার আর জায়গা নেই। আমার এই অনাদৃত রূপ যাঁর চোখে ভালো লেগেছে, সেই সুন্দর সমস্ত আকাশ দিয়ে আমাকে চেয়ে দেখচেন। এইবার মরেচে মেজ-বৌ !

তুমি ভাবচ আমি মরতে যাচ্চি—ভয় নেই, অমন পুরোণো ঠাট্টা

তোমাদের সঙ্গে আমি করব না। মীরাবাইও ত আমারি মত মেয়ে-মানুষ ছিল—তার শিকলও ত কম ভারি ছিল না, তাকে ত বাঁচবার জন্যে মরতে হয়নি। মীরাবাই তার গানে বলেছিল, "ছাড়ুক বাপ, ছাড়ুক মা, ছাড়ুক যে যেখানে আছে; মীরা কিন্তু লেগেই রইল, প্রভু, তাতে তার যা হবার তা হোক্!"* এই লেগে থাকাই ত বেঁচে থাকা।

আমিও বাঁচব। আমি বাঁচলুম।

তোমাদের চরণতলাশ্রয়চ্ছিন্ন—মৃণাল।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পত্র

সম্পাদক-মহাশয়সমীপেষু—

আপনি যে নূতন কাগজ বার করেছেন, তার যদি কোন উদ্দেশ্য থাকে ত সে হচ্ছে, নূতন কথা নূতন ধরণে বলা। এ উদ্দেশ্য সফল কর্‌তে হলে, নূতন লেখক চাই,—নচেৎ সবুজপত্র কালক্রমে শ্বেতপত্রে পরিণত হবে।

যদিচ আপনি মুখপত্রে "আমির" পরিবর্ত্তে "আমরা" শব্দ ব্যবহার করেছেন, তথাপি ঐ বহুবচনের পিছনে যে বহু লেখক আছেন, তার কোনও প্রমাণ পাওয়া গেল না। বাঙ্গলায় দ্বিবচন নেই, সম্ভবতঃ সেই কারণেই আপনি প্রথমপুরুষের বহুবচন ব্যবহার কর্‌তে বাধ্য হয়েছেন। কারণ অদ্যাবধি কেবলমাত্র দুটি লেখকেরই পরিচয় পাওয়া গেছে—এক সম্পাদক, আর এক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে গুণ্‌তির মধ্যে ধরা গেল না, কেননা আপনারা লেখার যা নমুনা দেখিয়েছেন, তার থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে আপনার প্রধান ভরসাস্থল হচ্ছে গদ্য। কারণ সোজা কথা বাঁকা করে এবং বাঁকা কথা সোজা করে বলা পদ্যের রীতি নয়।

আর ছিলুম আমি,—কিন্তু আর বেশিদিন যে থাক্‌ব কিম্বা থাক্‌তে পার্‌ব, এমন আমার ভরসা হয় না। হয় আপনি আমাকে ছাড়বেন, নয়ত আমি আপনাকে ছাড়ব। আমার লেখায়, আর যাই হোক্, সবুজপত্রের যে গৌরব বৃদ্ধি হয়নি, একথা সর্ব্ব-সমালোচক-সম্মত। এ অবস্থায়, "বীরবল" অতঃপর "আবুল-ফজল" হওয়া ব্যতীত উপায়ান্তর

দেখ্‌তে পাচ্ছেন না। ভবিষ্যতে আইন-ই-আঙ্গরেজি নামক যে নব-বিশ্বকোষ রচনা কর্‌ব—"সবুজপত্রে" তার স্থান হবে না। যদি "ফৈজি" হতে পারতুম, তাহলেও না হয় আপনার কাগজের জন্য একখানি দেশকালোপযোগী অর্থাৎ স্বয়ম্বরা-তিরস্কৃত একখানি "নলদমন" রচনা কর্‌তে পার্‌তুম, কিন্তু সে হবার যো নেই। আমাকে আবুল-ফজল হতেই হবে। আশা করি, বাঙ্গলার নবীন আবুল-ফজলদের মধ্যে কেউ-না-কেউ আমার সঙ্গে পেশা বদ্‌লে নেবেন, কেননা সাহিত্য-রাজ্যে বীরবলেরও আবশ্যকতা আছে। ইংরাজেরা বলেন—এক কোকিলে বসন্ত হয় না—অর্থাৎ আর পাঁচরঙ্গের আর পাঁচটি পাখীও চাই। বাঙ্গলা-সাহিত্যের উদ্যানে যদি বসন্তঋতু এসে থাকে, তাহলে সেখানে কোকিলও থাক্‌বে, কাঠ-ঠোক্‌রাও থাকবে, লক্ষ্মী-পেঁচাও থাকবে, হুতুম-পেঁচাও থাকবে। মনোরাজ্যে যখন নানা পক্ষ আছে তখন নানা পক্ষী থাকাই স্বাভাবিক। যেমন এক "বউ কথাকও" নিয়ে কবিতা হয় না, তেমনি এক "চোখ-গেল" নিয়ে দর্শনও হয় না।

উপরোক্ত ভাবে বাদসাদ দিয়ে শেষে দাঁড়াল এই যে, আপনার কাগজের যা প্রধান প্রয়োজন সেইটিই হচ্ছে তার প্রধান অভাব—অর্থাৎ নূতন লেখক। মনে রাখ্‌বেন যে, এদেশে আজকাল খাঁটি সাহিত্য চল্‌বে না, চল্‌বে যা—তা হচ্ছে জাতীয় সাহিত্য;—যদিচ এ কথার সার্থকতা কি সে সম্বন্ধে কারো স্পষ্ট ধারণা নেই। কোনও লেখা যদি সাহিত্য না হয়, তবুও তার আর মার নেই—যদি তা তথাকথিত জাতীয় হয়। এর কারণ, প্রথমতঃ আমরা বিশেষ্যের চাইতে বিশেষণের অধিক ভক্ত, দ্বিতীয়তঃ আমরা সাহিত্য বিচার কর্‌তে পারি

আর না পারি, জাত-বিচার কর্‌তে জানি। বলা বাহুল্য যে, দুহাতে কখনো জাতীয় সাহিত্য গড়ে তোলা যায় না। দুহাতে অবশ্য তালি বাজে। আপনারা যদি স্বজাতিকে অহর্নিশি করতালি দিতে প্রস্তুত হতেন, তাহলে আপনাদের হাতে জাতীয় সাহিত্য রচিত হত; কিন্তু সে বিষয়ে আপনাদের যখন তাদৃশ উৎসাহ দেখা যাচ্ছে না, তখন নূতন লেখক চাই।

বাঙ্গলা-লেখ্‌বার লোকের অভাব না থাক্‌লেও, "সবুজপত্রে" লেখ্‌বার লোকের অভাব যে কেন ঘট্‌ছে, তার কারণ নির্ণয় কর্‌তে হলে বঙ্গ-সাহিত্যের বর্ত্তমান অবস্থার পর্য্যালোচনা করা আবশ্যক।

বাঙ্গলা সাহিত্যে যে আজ বসন্তকাল উপস্থিত, "সবুজপত্রের" আবির্ভাব তার একমাত্র প্রমাণ নয়। ইতিপূর্ব্বেই স্বদেশী জ্ঞানবৃক্ষের নানা ডালপালা বেরিয়েছে, এবং অন্ততঃ তার একটি শাখায় —অর্থাৎ ইতিহাসের অক্ষয় শাখায়—এমন ফুল ফুটেছে ও ফল ধরেছে যা সমালোচকদের নখদন্তের অধিকার বহির্ভূত; কেননা সে ফুল তামার এবং সে ফল পাথরের।

কিন্তু আপনি পাঠকদের এই ফলাহারে নিমন্ত্রণ করেননি। আপনি সবুজপত্রে যে ফল পরিবেষণ কর্‌তে চান্, সে জ্ঞানবৃক্ষের ফল নয়, কিন্তু তার চাইতে ঢের বেশি মুখরোচক সংসারবিষবৃক্ষের সেই ফল, যা আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা অমৃতোপম মনে কর্‌তেন। সেই জাতীয় লেখকেরা হচ্ছেন আপনার মনোমত, যাঁরা কিছুই আবিষ্কার করেন না কিন্তু সবই উদ্ভাবনা করেন,—যাঁরা বস্তুজগৎকে বিজ্ঞানের হাতে সমর্পণ করে মনোজগতের উপাদান নিয়ে সাহিত্য গড়েন।

আমাদের সাহিত্যসমাজে কবি দার্শনিকের ভিড়ের ভিতর

বৈজ্ঞানিকদেরই খুঁজে পাওয়া ভার, অতএব আপনার স্বজাতীয় সাহিত্যিকের অভাব এদেশে মোটেই নেই। তাহলেও তাঁরা যে উপযাচী হয়ে এসে আপনাদের দলে ভিড়্‌বেন, তার সম্ভাবনা কম,—কেননা, যাতে করে দল বাঁধে, সেরকম কোনও মতের সন্ধান আপনাদের লেখায় পাওয়া যায় না।

সকল দেশেই মনেরও একটা চল্‌তি পথ আছে। অভ্যাসবশতঃ এবং সংস্কারবশতঃ দলে দলে লোক সেই পথ-ধরেই চল্‌তে ভালবাসে, কারণ মুখ্যতঃ সে পথ হচ্ছে জনসাধারণের জীবনযাত্রার পথ। সে পথ মহাজনদের হাতে রচিত হয়নি, কিন্তু লোকসমাজের পায়ে গঠিত হয়েছে। আপনারা বঙ্গ-সরস্বতীকে সেই পরিচিত পথ ছেড়ে একটি নূতন এবং কাঁচা রাস্তায় চালাতে চান। আপনারা বলেন—"সমুখে চল"; কিন্তু বুদ্ধিমানরা বলেন—"নগণস্যাগ্রতোগচ্ছেৎ!" আপনাদের মত এই যে, সামাজিক জীবনের পদানুসরণ করা কবি কিম্বা দার্শনিকের মনের কাজ নয়। জীবনকে পথ দেখানই হচ্ছে সে মনের ধর্ম্ম, অতএব কর্ত্তব্য। সুতরাং আপনাদের দ্বারা উদ্ভাবিত, অপরিচিত এবং অপরীক্ষিত চিন্তামার্গে অগ্রসর হতে অনেকেই অস্বীকৃত হবেন। বিশেষতঃ যখন সে পথের একটা নির্দ্দিষ্ট গন্তব্য স্থান নেই—যদি বা থাকে ত সে অলকা বর্ত্তমান-ভারতের পরপারে অবস্থিত। শুন্‌তে পাই, ইউরোপের সকল স্থল-পথই রোমে যায়। তেমনি এদেশের সকল হাঁটা-পথই কাশী যায়। কিন্তু আপনারা যখন বাঙ্গালীর মনকে কাশীযাত্রা না করিয়ে সমুদ্রযাত্রা করাতে চান, তখন যে নূতন লেখকেরা সবুজপত্র নিয়ে আপনাদের সঙ্গে এক-পংক্তিতে বসে যাবেন, এরূপ আশা করা বৃথা। সুতরাং আপনাদের সেই শ্রেণীর

লেখক সংগ্রহ কর্‌তে হবে যাঁদের কাছে আপনাদের সাহিত্য অচল নয়। এ দলের বহুলোক আপনার হাতের গোড়াতেই আছে।

গত বৈশাখ মাসের "ভারতী" পত্রিকাতে আপনি বিলেত-ফেরৎ বলে নিজের পরিচয় দিয়েছেন। প্রাচীন ব্রাহ্মণ-সমাজে এ সম্প্রদায়ের স্থান নেই—সুতরাং নূতন ব্রাহ্মণ-সমাজ অর্থাৎ সাহিত্য সমাজে এঁদের তুলে নেওয়া হচ্ছে আপনার পক্ষে কর্ত্তব্য। অতীতের উদ্ধারের পাল্টা-জবাব দিতে হলে, পতিতের উদ্ধার করা আবশ্যক।

বিলেত-ফেরতদের লেখায় আর কিছু থাক আর না থাক্—নূতনত্ব থাক্‌বেই। ৺ মাইকেল দত্ত, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং ৺ দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এই তিনটি বিলেত-ফেরৎ কবির ভাষায় ও ভাবে এতটা অপূর্ব্বতা ছিল যে, আদিতে তার জন্য এঁদের দুজনকে পুরাতনের কাছে অনেক ঠাট্টাবিদ্রূপ সহ্য কর্‌তে হয়েছিল। ৺ দ্বিজেন্দ্র লাল রায়কে যে কেউ ঠাট্টা করেন নি তার কারণ, তিনি সকলকে ঠাট্টা করেছেন। এই থেকেই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, বিলেত-ফেরতের হাতে পড়লে বঙ্গ-সাহিত্যের চেহারা ফিরে যায়।

আসল কথা, এ যুগের বঙ্গ-সাহিত্য হচ্ছে বিলেতি ঢংয়ের সাহিত্য। যে হিসেবে দাশরথি রায়ের পাঁচালি ও গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রা খাঁটি বাঙ্গলা-সাহিত্য—সে হিসেবে নব-সাহিত্য খাঁটি বঙ্গ-সাহিত্য নয়। এর জন্যে কেউ কেউ দুঃখও করেন। চোখের জল ফেলবার কোনও সুযোগ বাঙ্গালী ছাড়ে না। ব্যাস-বাল্মিকীর জন্যও আমরা যেমন কাঁদি, পাঁচালিওয়ালাদের জন্যও আমরা তেমনি কাঁদি। কিন্তু সমালোচকেরা চক্ষের জলে বক্ষ ভাসিয়ে দিলেও, বঙ্গ-সরস্বতী আর গোবিন্দ অধিকারীর অধিকার ভুক্ত হবেন না, এবং দাশরথিকেও সারথি কর্‌বেন না।

আমাদের নব-সরস্বতী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠিতা এবং কলেজে শিক্ষিত লোকেরাই অদ্যাবধি তাঁর সেবা করে আস্‌ছেন এবং ভবিষ্যতেও কর্‌বেন—কেউ ফোঁটা কেটে, কেউ হ্যাট পরে। এই প্রভেদের কারণ নির্দ্দেশ করছি। পুরাকালে যখন ক্ষত্রিয়েরা একসঙ্গে সুরা এবং সোম পান্ কর্‌তেন, তখন ব্রাহ্মণেরা এই শান্তি-বচন পাঠ করতেন

—"অহে সুরা ও সোম, তোমাদের জন্য দেবগণ পৃথক্ পৃথক্ রূপে স্থান কল্পনা করিয়াছেন। তুমি তেজস্বিনী সুরা, আর ইনি রাজা সোম, তোমরা আপন আপন স্থানে প্রবেশ কর।"

আমরাও কলেজে যুগপৎ ইংরাজি সুরা এবং সংস্কৃত সোম পান করেছি। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের দুটি পাকস্থলী না থাকায়, সেই সুরা আর সোম আমাদের উদরস্থ হয়ে পরস্পর লড়াই কর্‌ছে। আমাদের সাহিত্য সেই কলহে মুখরিত হয়ে উঠেছে। আমাদের যে নেশা ধরেছে, সে মিশ্র-নেশা। তবে কোথাও বা তাতে সুরার তেজ বেশি, কোথাও বা সোমের। মনোজগতে যে আমরা সকলেই বিলেত ফেরৎ, এই কথাটা মনে রাখলে, সাহিত্য-মন্দিরে আপনার সম্প্রদায়কে প্রবেশ করতে সাহিত্যের পাণ্ডারা আর বাধা দেবেন না, বরং উৎসাহই দেবেন; কেননা আমরা সকলেই ইংরাজি-সাহিত্যে শিক্ষিত, আপনারা উপরন্তু ইংরাজি-সভ্যতায় দীক্ষিত।

সামাজিক হিসেবে বিলেত-ফেরতদের এই গুরুগৃহ-বাসের ফল যাই হোক, সাহিত্য-হিসেবে এর ফল ভাল হবারই সম্ভাবনা। কারণ ইংরাজি-জীবনের সঙ্গে ইংরাজি-সাহিত্যের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। ইংরাজি-জীবনের সঙ্গে যাঁর সাক্ষাৎ-পরিচয় আছে, তিনি জানেন যে ইউরোপে সাহিত্য হচ্ছে জীবনের প্রকাশ ও প্রতিবাদ—আর সে

পরিচয় যাঁর নেই, তিনি ভাবেন যে, ও শুধু বাদানুবাদ। সাহিত্যের ভাষ্য ও টীকা জীবনসূত্র হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে তা শুধু কথার কথা হয়ে ওঠে। সেই কারণে নব-শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের জীবনে ইংরাজি-জীবনের প্রভাব যে পরিমাণে কম, তাঁদের রচিত সাহিত্যে ইংরাজি কথার প্রভাব তত বেশি। এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ আমাদের স্বদেশী বক্তৃতায় ও লেখায় নিত্য পাওয়া যায়। সংস্কৃত ভাষার ছদ্মবেশ পরিয়েও বিলেতি মনোভাবকে আমরা গোপন করে রাখতে পারিনে। বিদেশী ভাবকে আমি অবশ্য মন থেকে বহিষ্কৃত করে দেবার প্রস্তাব কর্‌ছি নে,—কারণ যে সকল ভাব সাত সমুদ্র তের-নদীর পার থেকে উড়ে এসে আমাদের মনোজগতে জুড়ে বসেছে, তাদের বেবাক্ উপ্‌ড়ে ফেলাও সম্ভব নয়, এবং সম্ভব হলেও তাতে মন উজাড় হয়ে যাবে। তবে যা জালে ওঠে তাই যেমন মাছ নয়—তেমনি যা ভুঁই ফুঁড়ে ওঠে তাই গাছ নয়। বিলেতিজীবনে বিলেতিসাহিত্য যাচাই করে নিতে না পার্‌লে, এই বিদেশী ভাবের জঙ্গলের মধ্যে থেকে সাহিত্যের উদ্যান গড়ে তুলতে পারব না। এই পরখ কর্‌বার কাজটি সম্ভবতঃ বিলেত-ফেরতেরাই ভাল পার্‌বেন।

তবে সাহিত্য-সমাজে প্রবেশ কর্‌তে এঁরা সহজে স্বীকৃত হবেন না। লিখ্‌তে অনুরোধ কর্‌বামাত্র এঁরা উত্তর কর্‌বেন যে, "আমরা বাঙ্গলা লিখ্‌তে জানিনে।" কিন্তু ও কথা শুনে পিছ-পাও হলে চল্‌বে না। সেকেলে বিলেত-ফেরতেরা বল্‌তেন যে তাঁরা বাঙ্গলা বল্‌তে পারেন না। অথচ সে বিনয় কিম্বা সে স্পর্দ্ধা যে সত্য নয়, তার প্রমাণ আজ বিলেত-ফেরতের মুখে মুখে পাওয়া যায়। হতে পারে যে, বাংলা লিখ্‌তে পারিনে একথা বলায় প্রমাণ হয় যে, বক্তা ইংরাজি লিখ্‌তে পারেন।

অথচ এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে, যে-লেখা সাহিত্য বলে গণ্য হতে পারে, সে-ইংরাজি কোন দেশী লোক লিখ্‌তে পারেন না। যাঁরা আদালতে এবং সভাসমিতিতে ইংরাজি ভাষায় ওকালতি এবং "কলাবতী" করেন, তাঁরা যে ও-ভাষায় শুধু পড়া-মুখস্থ দেন তা শ্রোতামাত্রেই বুঝতে পারে। আমরা আইন-সম্বন্ধে এবং রাজনীতি-সম্বন্ধে ইংরাজ-রাজপুরুষের কাছে নিত্য পরীক্ষা দিতে বাধ্য, সুতরাং ও দুই ক্ষেত্রে মুখস্থ-বিদ্যা যার যত বেশি, সে তত বড় বড় প্রাইজ পায়; কিন্তু তার থেকে এ প্রমাণ হয় না যে, ঐ প্রাইজের দৌলতে তাঁরা ইংরাজি সাহিত্য-সমাজে প্রোমোসন্ পান। সুতরাং সাহিত্য বস্তু যে কি, তা যিনি জানেন, তাঁকে ইংরেজি ত্যাগ করে বাঙ্গলা লেখাতে প্রবৃত্ত করতে কিঞ্চিৎ সাধ্য-সাধনার আবশ্যক হবে। বিলেতি বুট ত্যাগ করলে বঙ্গসন্তান যে স্বদেশের সাহিত্যক্ষেত্রে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করতে পারেন সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই—তবে বুট ছেড়ে যদি পণ্ডিতি খড়ম পরে বেড়াতে হয় তাহলে অবশ্য তা আরও বিপদের কথা হবে। কিন্তু বঙ্গ-সরস্বতীর মন্দিরে খোলা পায়ে প্রবেশ করাটাই যে কর্ত্তব্য এবং শোভন, সুশিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেরই সেটি বোঝা উচিত। অবশ্য পণ্ডিতি-খড়মের প্রধান গুণ এই যে, তা যত বেশি খট্‌খটায়মান হবে, লোকে তত বেশি "সাধু সাধু" বল্‌বে। কিন্তু এটি মনে রাখা উচিত যে, আশৈশব ও-বস্তুর ব্যবহারে অভ্যস্ত না হলে, খড়মধারীদের পদে পদে হোঁচট খাওয়া অনিবার্য্য।

বিলেত-ফেরতকে লেখক তৈরি করার প্রধান বাধা হচ্ছে যে, তাঁরা অধিকাংশই আইন-ব্যবসায়ী। উকিল ও কোকিল হচ্ছে বিভিন্ন শ্রেণীর জীব—যদিচ উভয়েই বাচাল। এর এককে দিয়ে অপরের

কাজ করানো যায় না। তবে কথা হচ্ছে এই যে, যে লঙ্কায় যায় সেই যেমন রাক্ষস হয়ে ওঠে, তেমনি যে আদালতে যায় সেই যে রাসবিহারী হয়, তা নয়। সকলেই জানেন যে, এ দেশের কত বিদ্যাবুদ্ধি আদালতের মাঠে মারা যাচ্ছে। তার কারণ ও শুষ্ক এবং কঠিন ক্ষেত্রের রস আত্মসাৎ করা দূরে থাকুক, অনেকের মন তাতে শিকড়ও গাড়্‌তে পারে না। এ অবস্থায় যে অনেকে আদালতের মাটি-কামড়ে পড়ে থাকেন তার কারণ, ও স্থান ত্যাগ করলে হাঁসপাতালে যাওয়া ছাড়া এদেশে স্বাধীন ব্যবসায়ীর আর গত্যন্তর নেই। তাই নিত্যই দেখ্‌তে পাওয়া যায় বহু বিদ্বান ও বুদ্ধিমান লোক, এক ফোঁটা জল না খেয়ে, দিনের পর দিন, ন্যুব্জশিরে কুব্জপৃষ্ঠে অগাধ আইনের পুস্তকের ভার বহন করে আদালতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। সে গুরুভারে পৃষ্ঠদণ্ড ভঙ্গ হলেও যে তাঁরা পৃষ্ঠ-ভঙ্গ দেন না, তার আর একটি কারণ এই যে, এই মরুভূমিতে তাঁরা নিত্য রজতমায়ার মরীচিকা দেখেন। সুতরাং এই আইনের দেশ একবারে ত্যাগ কর্‌তে কেউ রাজি হবেন না; তবে মধ্যে মধ্যে সবুজপত্রের ওয়েসিসে এসে বিশ্রামলাভ কর্‌তে এঁদের আপত্তি নাও হতে পারে। আপনি শুধু এইটুকু সতর্ক থাকবেন যে, এমন লোক আপনার বেছে নেওয়া চাই যার মন ইংরাজের আইনের নজিরবন্দী হয়নি।

আমার শেষ কথা এই যে, যেন তেন প্রকারেণ আপনার নিজের দলের লোককে,—আর কোনও কারণে না হোক, আত্মরক্ষার জন্যও —আপনাকে লেখক তৈরি করে নিতে হবে—কারণ তাঁরা যদি লেখক না হন, তাহলে তাঁরা সব সমালোচক হয়ে উঠবেন। ইতি

বীরবল।

উপমা ও অনুপ্রাস

ভাব-পদার্থকে পরিস্ফুটরূপে প্রকাশ করিবার জন্য কবিগণ উপমা প্রয়োগ করিয়া থাকেন। এ বিষয়ে যাঁহার ঐশ্বর্য্য যত বেশি, কবি-সমাজে তিনি যে তত উচ্চ আসন অধিকার করেন, এ সম্বন্ধে দ্বিমত নাই। কিন্তু অনুপ্রাসের সার্থকতাসম্বন্ধে সকলে একমত নহেন। কাহারও কাহারও মতে এই শব্দালঙ্কারের ব্যবহারে ভাবের মূর্ত্তি ঢাকা পড়ে।

এ কথা অবশ্য মনে করা ভুল যে, কাব্যে অনুপ্রাসের কোনও স্থান নাই। রূপের সাদৃশ্য হইতে যেমন উপমা জন্মলাভ করিয়াছে, তেমনি শব্দের সাদৃশ্য হইতে অনুপ্রাস জন্মলাভ করিয়াছে। রসায়নে আণবিক আকর্ষণের বলে, যেমন অণুর সঙ্গে অণু মিলিত হয় তেমনি একটি বিশেষ হৃদয়াবেগের প্রকাশের তাড়নায় বিশেষ বিশেষ শব্দ তাহার জুড়িকে খুঁজিয়া লয়। এই যে শব্দের সহিত শব্দের সহজ সঙ্গতি, ইহার মূলেও শব্দ-রাজ্যের কোনো গূঢ় রাসায়নিক আকর্ষণ বিদ্যমান। পাতায় পাতায় লাগিয়া যেমন মর্ম্মরধ্বনি উঠে, তরঙ্গে তরঙ্গে অভিহত হইয়া যেমন কলগান জাগে, সেইরূপ কথা যখন তাহার জুড়ির সহিত মিলিত হয়, তখন সেই মিলনের ফলে এক অপূর্ব্ব সঙ্গীত কাব্যে হিল্লোলিত হইয়া উঠে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ রবীন্দ্রনাথের "ক্ষণিকা"র একটি কবিতার তিনটি ছত্র উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

কাছে এলে যবে হেরি অভিনব
ঘোর ঘননীল গুণ্ঠন তব
চলচপলার চকিতচমকে করিছে চরণ বিচরণ।

এটি বোধ হয় কোনো বর্ষার কবিতা হইবে। শেষ-ছত্রটিতে যে অনুপ্রাসের লীলা আছে বিদ্যুতের নৃত্যলীলার সঙ্গে তাহার সাদৃশ্য স্পষ্ট।

কিন্তু সাহিত্যে যখন ভাবের দৈন্য ঘটে, তখন বলিবার-ভঙ্গী বলিবার-বিষয়কে অতিক্রম করে। যেখানে রসের অভাব আছে, সেখানে কবিরা রচনার চাতুর্য্যের দ্বারা সেই আন্তরিক শুষ্কতা গোপন করিবার প্রয়াস পান। শ্রোতাদের মুগ্ধ করিবার জন্য তখন তাঁহারা অপূর্ব্ব উপমা এবং নিরবচ্ছিন্ন অনুপ্রাসের সাহায্য গ্রহণ করিতে বাধ্য হন।

উপমা ভাবানুসারী না হইলে তাহা যে কতদূর পর্য্যন্ত কৃত্রিম হইতে পারে, তাহার উদাহরণ সংস্কৃত-কাব্যেও বিরল নহে। সংস্কৃত-কাব্যের জোয়ারের মুখে যে উপমাগুলি শুভ্রফেণকিরীটের মত ভাবের তরঙ্গের চূড়ায় চূড়ায় ঝলমল করিয়াছে, ভাঁটার সময়ে সেই উপমা-গুলিই ক্রমে অধোগতি প্রাপ্ত হইয়া ভাবের মরা-স্রোতকে পঙ্কিল করিয়া তুলিয়াছে।

এইরূপ কষ্টকল্পিত এবং অসঙ্গত উপমার দুএকটি নমুনা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

"ভ্রূরেখাযুগলং ভাতি তস্যাশ্চটুলচক্ষুষঃ।
পত্রদ্বয়ীব হরিতা নাসাবংশবিনির্গতা॥"

অর্থাৎ, চঞ্চলনয়না সেই রমণীর ভ্রূদুটি, নাসারূপ বংশের হরিৎবর্ণ দুটি পত্রের ন্যায় শোভা পাইতেছে।

অপর একটি শ্লোক ইহা অপেক্ষাও অদ্ভুত। সেটি এই—

"বেণী শ্যামা ভুজঙ্গীয়ং নিতম্বান্মস্তকং গতা।
বক্ত্রচন্দ্রসুধাং লেঢ়ুং সান্দ্রসিন্দূরজিহ্বয়া॥"

অর্থাৎ, অতি গাঢ় সিন্দূররূপ জিহ্বাদ্বারা মুখচন্দ্রের সুধাপান করিবার জন্যই যেন কালো ভুজঙ্গীর মত বেণীটা নিতম্বদেশ হইতে মস্তকে আরোহণ করিতেছে।

উপমার উপর জোরজবরদস্তি করিলে তাহা যে কতদূর অস্বাভাবিক হইয়া উঠে, তাহার উদাহরণ যেমন সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্য হইতে দেখানো গেল, তেমনি অনুপ্রাস যখন শব্দের উপর শব্দ চাপাইয়া ভাবের প্রাণ বাহির করিয়া দিবার আয়োজন করে, তখন তাহার উপদ্রব যে কতদূর বিরক্তিকর হয়, তাহার প্রমাণ প্রাচীন বাংলা-সাহিত্য হইতে সংগ্রহ করা কঠিন নয়।

প্রাচীন বাংলা-সাহিত্যের ভাঁটার সময় এই অনুপ্রাসের ঘটা বাঙালী কবিদের পক্ষে শ্রোতার মনোরঞ্জনের প্রধান সম্বল হইয়া উঠিয়াছিল। অনুপ্রাসের ভেল্কিবাজি যে-কবি যত দেখাইতে পারিত, শ্রোতাদের চমৎকৃত করিবার সম্ভাবনা তাহার পক্ষে তত বাড়িয়া যাইত। বলা বাহুল্য, দাশরথি রায়ের পাঁচালি এ বিষয়ে স্বনামধন্য হইয়াছে। দীনেশবাবুকর্ত্তৃক আবিষ্কৃত কৃষ্ণকমল গোস্বামী নামক জনৈক উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী কবির কবিতা হইতে অনুপ্রাসের একটি উদাহরণ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

"বিদ্যুতলজ্জিতকৃত যে রূপসী
সে রূপচ্ছেদক বিদ্যুন্‌রূপ অসি,

মরি ! কি দারুণ অসি, পশি কৈল মসী,
শশিরাশি-জিত যে শশী,—
হ'ল সে শশী অসিত চতুর্দ্দশীর প্রায় ॥"

অনুপ্রাস যে কতটা প্রলাপের মত হইয়া উঠিতে পারে, পূর্ব্বোক্ত উদাহরণই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

এই যুগসঞ্চিত কৃত্রিম উপমার আবর্জ্জনা ও কৃত্রিম অনুপ্রাসের জঞ্জাল সাহিত্যক্ষেত্র হইতে দূর করিবার জন্য কোনো কোনো আধুনিক কবি এতই উৎসুক হইয়াছিলেন যে, কাব্যকে একেবারে নিরাভরণ করা তাঁহারা অত্যাবশ্যক মনে করিতেন। ইঁহাদের মতে অলঙ্কারের অন্তরালে ভাবের সৌন্দর্য্য চাপা পড়িয়া যায়, সুতরাং মনোভাবকে যত সজ্জামুক্ত করিতে পারিবে ততই তাহার রূপ ব্যক্ত হইয়া উঠিবে। প্রসিদ্ধ ইংরাজ-কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ পূর্ব্বোক্ত মতাবলম্বী; তাই তিনি উপমা-প্রয়োগসম্বন্ধে নিতান্ত কৃপণ ছিলেন। যদি কখনো তাঁহার কলমের মুখ দিয়া কোনও উপমা বাহির হইয়া পড়ে তবে তাহা "Phantom of delight"-গোছের,—অর্থাৎ একেবারে রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ-বর্জ্জিত।

উপমা ও অনুপ্রাসের প্রতি মনস্বী লেখকদের এতটা বীতরাগ হইবার কারণ, উহা মন্দকবির হাতে সহজেই বিকৃত হইয়া পড়ে। যাহারা উপমাকে কাব্যদেহে অর্পিত বাহ্য অলঙ্কারস্বরূপ মনে করে, তাহাদের লক্ষ্য যে তাহার বাহুল্য ও গঠন-চাতুর্য্যের দিকেই থাকিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? এক-শ্রেণীর কবিরা উপমাকে গহনা হিসাবে ব্যবহার করিয়াছিলেন বলিয়া, অপর শ্রেণীর কবিরা সে গহনা খুলিয়া ফেলিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন।

কিন্তু আমরা এখন এই সত্য আবিষ্কার করিয়াছি যে, উপমা

ফরমায়েস দিয়া তৈরি করাইবার জিনিষ নয় ;—কেননা, তাহা কাব্য-দেহের অলঙ্কার নয়, কিন্তু কাব্যের প্রাণস্বরূপ। কেন আমরা এরূপ মনে করি, তাহা একটু বুঝাইয়া বলিতে চাই।

এ জীবনে বস্তুমাত্রেরই সহিত আমাদের দ্বিবিধ কারবার—এক শরীরের, আর এক মনের। আকাশ, বাতাস, জল, অগ্নি প্রভৃতি সকল জিনিস আমাদের চিন্তার সহিত, অনুভূতির সহিত, নানা প্রকারে জড়িত গ্রথিত হইয়া যায় বলিয়া, অনির্ব্বচনীয় ভাব ক্রমাগতই তাহাদের সাহায্যে বচনীয় হইতেছে। সেইজন্য কোনো কথা বলিতে গেলে, উপমা দিতে পারিলেই মনে হয় কথাটাকে যেন রূপ দেওয়া গেল,—এতক্ষণ পর্য্যন্ত যে কথাটা মনের আকাশে বাষ্পের মত অত্যন্ত অনির্দ্দিষ্টভাবে অবস্থিত ছিল, এইবার যেন তাহাকে একটি সংহত সুন্দর স্পষ্ট আকার দেওয়া গেল। শুধু তাই নয়, ভাল উপমা মুখ হইতে বাহির হইবামাত্র মনে হয় যেন আমার কথার সায় সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়িয়া পাওয়া যায়। আমি যে ভাবনা ভাবিতেছি, সেই ভাবনা যেন নানা আকারে, নানা আভাসে, নানা ইঙ্গিতে, নানা ভঙ্গীতে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপ্ত হইয়া আছে।

এক বস্তুর সহিত অপর বস্তুর, এক ভাবের সহিত অপর ভাবের যোগসাধন করাই উপমার কার্য্য। কেবল তাহাই নহে, কবিরা নির্ভয়ে বস্তুর ধর্ম্ম মনেতে, এবং মনের ধর্ম্ম বস্তুতে আরোপ করেন। "ভাব হতে রূপে অবিরাম যাওয়া আসা"—এই উপমার সেতুর সাহায্যেই সাধিত হয়। উপমা রূপ হইতে ভাবে ক্রমাগতই যাতায়াত করিতেছে। যে বাধা বিজ্ঞানের কাছে, দর্শনের

কাছে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা—হিমালয়ের পর্ব্বত-প্রাচীরের অপেক্ষাও দুর্লঙ্ঘ্য —তাহা উপমার কাছে মস্‌লিনের তিরস্করণীর মতও নয়।

বিজ্ঞান একসময়ে মানব-মনের এই সহজ প্রবৃত্তির বিরোধী ছিল, এবং তাহার স্বচ্ছন্দ গতিতে বাধা দিতে চেষ্টা করিয়াছিল; কারণ বৈজ্ঞানিক মতে বিশেষ-বস্তুর বিশেষ-জ্ঞানের অভাববশতই কবি-কল্পনা, যাহা বস্তুত পৃথক তাহার ঐক্য-সাধন করিতে বৃথা চেষ্টা করিত। কিন্তু এ যুগের বিজ্ঞান আমাদিগকে বলিয়া দিয়াছে যে, পৃথিবীতে ক্রমাগতই এক হইতে আরে, রূপ হইতে রূপান্তরে প্রাণের ও শক্তির যাত্রা চলিয়াছে। জীবজগতে অভিব্যক্তিবাদ ও বস্তুজগতে নব-আণবিক-সিদ্ধান্ত আমাদিগকে এই কথাই জানাইয়াছে যে, বিশ্ব প্রতিমুহূর্ত্তেই রূপান্তরিত হইতেছে, এখানে কিছুই স্থির হইয়া বসিয়া নাই। জীবজগতে প্রাণের রূপও স্থির নহে, জড়জগতে অণুর রূপও স্থির নহে।

যখন এই কথা চিন্তা করি যে, সৌরজগতের সেই অবিভক্ত অসংহত বাষ্পপিণ্ডের ঘূর্ণি, তৎপরে সংহত পৃথিবীগ্রহের মহাসমুদ্রের উন্মত্ত আলোড়ন, সমুদ্রগর্ভ হইতে উত্তপ্ত পর্ব্বতোচ্ছ্বাস, জীবপঙ্কের আবির্ভাব, খাদ্যরসের রক্তে পরিণতি ও জীবের প্রজনন-শক্তি, এবং ক্রমে বিচিত্র জীবদেহের অভিব্যক্তি,—এই সমস্ত যুগযুগান্তরের ক্রিয়াগুলি এই শরীরের অণুপরমাণুর মধ্যে মগ্ন-চেতনার অন্ধকার-রাজ্যে কত অস্পষ্ট সংস্কাররূপে বিদ্যমান রহিয়াছে, তখনি বুঝিতে পারি বিশ্বের সর্ব্বত্র আমার মন কেন উপমার জাল ফেলিয়াছে।

বিজ্ঞানের অভ্যুদয়কালে কিন্তু ইহার উল্টা কথাটাই লোকের

মনে হইয়াছিল। মনে হইয়াছিল বুঝি কবির অনুভূতির মধ্যে কোনো সত্যই নাই। কাব্যও হঠাৎ তাহার উপমার প্রদীপ ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিল। বিজ্ঞানের সাহায্যে সে বাস্তবকে যে ভাবে দেখিতে শিখিল, তাহাতে বুঝিল যে উপমা সত্যের শুভ্রজ্যোতিকে শুধু মলিন করে। বিজ্ঞান আজ আবার ইন্দ্রিয়গোচর বিশ্বের চতুর্দ্দিকে অতীন্দ্রিয় লোকের কত দ্বার বাতায়ন উন্মুক্ত করিয়া দিতেছে। সত্য যে স্থির পদার্থ নয়, তাহা যে উপমার নিদান,—রূপ হইতে রূপান্তরের মধ্য দিয়াই যে তাহার পরিচয় পূর্ণতর হইতেছে, এই জ্ঞানের প্রভাব আজ সাহিত্য-রাজ্যেও লক্ষিত হইতেছে। সত্যকে মানুষ একদিন স্থির জানিয়াছিল; এখন সে দেখে যে যাহা স্থির তাহাই মৃত্যু, অর্থাৎ সৃষ্টির বহির্ভূত, এবং এই সত্যের ব্যক্তি উপমায়। কারণ উপমা তো সত্যকে বাঁধে না;—সে কেবলি বলে, এই রকম, এই রকম। অনির্ব্বচনীয়কে সে কেবলি বচনগম্য করে, অনন্তকে সান্তরূপে প্রকাশ করে;—কিন্তু সে বচন, সে রূপ যে স্থায়ী নয়, তাহাও সে নিজেই জানে।

ঐন্দ্রিয় হইতে অতীন্দ্রিয় লোকে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে সাহিত্যের মধ্যেও অধুনা একটা অস্বাভাবিক উত্তেজনার লক্ষণ দেখা দিয়াছে। এ জগতে কোনও নূতন সত্যের আবির্ভাবের সহিত যে আনন্দ ও যে ভয় জড়িত থাকে, তাহাকে একজন আধুনিক লেখক cosmic nervousness—বিশ্বের বেপথু বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এই কারণেই ঐন্দ্রিয় হইতে অতীন্দ্রিয়লোকে যাত্রার মুখে আধুনিক সাহিত্যে একটি অস্বাভাবিক উত্তেজনার লক্ষণ দেখা

দিয়াছে। খ্যাতনামা ইংরাজলেখক এচ্, জি, ওয়েল্‌স্ বলিয়াছেন, "মানুষ সংকীর্ণ দিক্‌চক্রবালের দ্বারা সীমাবদ্ধ জগৎ হইতে আজ অনন্ত দৃশ্যময় ও ঘটনাময় এক বিশাল জগতে যাত্রা করিতেছে— সেখানকার অস্পষ্টতা ও অন্ধকার তাহার নিকট কি ভয়াবহ!" বিশ্ব যে অসীমের বিচিত্র কাব্য, এই কথাটার আভাসমাত্রে মানুষকে এমনি বিহ্বল করিয়াছে যে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত মানুষ সেই অস্পষ্ট অন্ধকারলোকের পথঘাট আবিষ্কার না করিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত যে সাহিত্য রচিত হইবে, তাহার মধ্যে একটি অস্থির ত্রস্ত ভাব পদে পদেই লক্ষিত হইবে।

আধুনিক ইউরোপীয় সাহিত্যে এই অশান্ত উত্তেজিত ভাবের লক্ষণই বেশি করিয়া চোখে পড়ে। টমাস হার্ডি হইতে জন্ গ্যাল্‌স্‌ওয়ার্দি, বার্ণাড শ হইতে নিট্‌সে ও মেস্‌ফিল্ড প্রভৃতি সকল সাহিত্যিকের মধ্যে আধুনিক জীবনের যে সুতীব্র প্রতিবাদ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার মূলে একটি অদম্য অসন্তোষ বিদ্যমান। বিশ্বামিত্রের ন্যায় ইঁহারা প্রত্যেকেই একএকটি নূতন বিশ্ব সৃষ্টি করিতে চাহেন। নব-সাহিত্যের এই সকল সৃষ্টি বাষ্পলোকের মত অত্যন্ত অনির্দ্দিষ্ট ও ছায়াময়। কেননা বাহিরের ও ভিতরের মিলনে নয়— বিরোধের উপরেই এই সকল কবি-সৃষ্টি প্রতিষ্ঠিত।

কালিদাস প্রভৃতির রচনার তুলনায় ইঁহাদের কাব্য যে অসম্পূর্ণ এবং শ্রীভ্রষ্ট, তাহার কারণ পূর্ব্ব কবিদিগের মনে শিবশক্তির যে মিলন ছিল, নব্য-কবিদের মনে তাহার বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে। তাই ইঁহারা ইঁহাদের কাব্যে কোনও নূতন সত্যকে সাকার করিয়া তুলিতে পারেন না, পারেন শুধু নিজ মনের বিকারকে প্রকাশ করিতে।

আধুনিক সাহিত্যের নবজীবনের এই ছট্‌ফটানিকে অনেকে দুর্গতির সূত্রপাত মনে করিয়া নিরাশ হন। তাঁহারা ভুলিয়া যান্ যে সংকোচন ও প্রসারণের দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়াই সকল সৃষ্টির বিকাশ। হঠাৎ একদিন এই সংকোচের বাধা অপসারিত হইলে দেখা যাইবে যে, যেখানে সংঘাত ছিল, সেইখানে সঙ্গীত বাজিতেছে, যেখানে উচ্ছৃঙ্খলতা ছিল, সেইখানে সৌন্দর্য্য জাগিতেছে।

মানুষের মন এখন সত্যের পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করিতেছে —বাহ্যজগত ও মনোজগতের স্পষ্ট পার্থক্য ভুলিয়া উহাদের অস্পষ্ট সম্বন্ধ অনুভব করিতেছে। এই নূতন অনুভূতির বলে কাব্যে উপমা আবার স্বীয় স্থান অধিকার করিবে, এবং এই নবজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে বিকশিত হইয়া উঠিবে।

শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী।

সহজিয়া

ওরে সহজিয়া, কোন্ সহজে
মজেছে তোর প্রাণ !
লাগ্‌ল বুকে কোন্ সহজের
এত কঠিন টান ?
যে সহজ ঐ ফুট্‌ল ফুলে,
লতা-পাতায় উঠ্‌ল দুলে,
যে সহজের ঢেউ লেগেছে
পাখীর কণ্ঠে গান।
ছুট্‌চে নদী সাগর-পানে,
বারণ কারো নাইক মানে,
সহজ রসের ধারায় ভাসে
ধরার বক্ষখান।
অবোধ সুখের নেশার মুখে
এ উহারে টানচে বুকে,
মরণজয়ী প্রাণের চলে
অসীম অভিযান ॥

কান্না-হাসির সহজ তানে
আকুল ভরপূর
বিশ্বযাত্রা বাজায় প্রাণে
রাখাল বাঁশীর সুর।
অন্ধ মূঢ় এই সহজে
মজুক যাহার পরাণ মজে,
শিশুর সহজ, কাছের সহজ,
নাই কিছু ওর দূর।
আসুক ঝঞ্ঝা, লাগুক দ্বন্দ্ব,
বাজুক দ্বিধার দোদুল ছন্দ,
ভালো মন্দ এ ওর পানে
হানুক মরণ-বাণ,
জান্‌বো আমি, চিন্‌ব আমি,
হারবো আমি, জিন্‌ব আমি,
চাখ্‌বো আমি, রাখ্‌বো আমি,
করব খানখান্ ॥

দেহ মনের কণায় কণায়
চেতন হব আমি।
তারি পরে রঙীন মোহের
আলো আসুক নামি।

ঝড়ের সাথে নাচুক শান্তি,
সত্য সাথে মিলুক ভ্রান্তি ;
যে মরণের সহজ মাঝে
জাগে নূতন প্রাণ
সেই সহজে দুলুক দ্বন্দ্ব,
দুঃখ সুখের মহানন্দ,
ওঠাপড়া ভাঙাগড়ার
করুক্ ছন্দ দান ॥

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচি।

দেবতা

ভাগ্যে তোমার নয়ক দেউল মস্ত ইমারত,
যেথায় লোকের হুড়াহুড়ি, রুদ্ধ সদাই পথ।
ভাগ্যে তোমার গৃহে যেতে পাণ্ডা প্রহরীকে
সাধতে না হয়, ঢুকতে না হয় কায়দাকানুন শিখে।
তাই ত মোরা নৃত্য করি তোমার আঙিনায়,
যখন খুসি দুয়ার খুলে প্রণাম করি পায়।
ছুটি পেলেই তোমার সাথে একলা ঘরে রই,
পরাণ খুলে শ্রবণমূলে মনের কথা কই।

ভাগ্যে তোমার নয়ক ভোগের মস্ত আয়োজন,
বইতে জিনিস হয়না হাজার লোকের প্রয়োজন।
তোমার অর্ঘ্য আহরণের বিষম উপদ্রবে
প্রমাদ নাহি গণে দেশের দুঃখী লোকে সবে।
চাষের চালে ঘরের দুধে গাছের ফলে ফুলে
যেদিন যাহা জুটে তাহাই জোগাই চরণমূলে।
পৃথক আয়োজনের কোনো নেইক দাবিদাওয়া
এক থালাতেই তোমার আমার আগে পিছে খাওয়া।

ভাগ্যে তোমার নেইক খেয়াল দেমাক অভিমান,
মোদের চেয়ে অল্প পেয়ে তুষ্ট তোমার প্রাণ।
মারীভয়ের দিনে তুমি ভাবো মোদের তরে,
বর্ষাকালে মোদের সনে ভিজো ভাঙা ঘরে।
বন্যা-দিনে উপোষ কর আমাদেরি সাথে,
মোদের সনে জেগে রহ উৎসবেরি রাতে।
মন্ত্র কোথা ? প্রাণের ভাষায় তোমার পূজা করি।
অবোধেরও ঠাকুর তুমি কাঙালেরও হরি !

শ্রীকালিদাস রায়।